ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
*দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন*

# জাতীয় রাজস্ব বোর্ড:
# স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের উপায়

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
*দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন*

# জাতীয় রাজস্ব বোর্ড:
# স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের উপায়


**গবেষণা এবং প্রতিবেদন রচনা**

এম. জাকির হোসেন খান
নীনা শামসুন নাহার

# জাতীয় রাজস্ব বোর্ড: স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের উপায়


**গবেষণা উপদেষ্টা**

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ
*সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ড, টিআইবি*

এম. হাফিজ উদ্দিন খান
*সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ড, টিআইবি*

ড. ইফতেখারুজ্জামান
*নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি*

**গবেষণা এবং প্রতিবেদন রচনা**

এম. জাকির হোসেন খান
নীনা শামসুন নাহার



প্রকাশ সময়কাল : জুলাই ২০১২

**সম্পাদনা**

কুতুব আজাদ এবং শাহজাদা এম. আকরাম

**কৃতজ্ঞতা**

আসিফ রেজা অনিক ও টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগের সকল কর্মী

ISBN: 978-984-33-3669-9



## যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা - ১২১৩, বাংলাদেশ
টেলিফোন: ৮৮০ ২ ৮৮২৬০৩৬
ফ্যাক্স: ৮৮০ ২ ৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: http://www.ti-bangladesh.org

৫.৯ সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট: দুর্নীতি সংঘটনের সহযোগী ৩৬
৫.১০ কর মওকুফ এবং প্রত্যর্পণ অফিসে দুর্নীতি ৩৬
**ষষ্ঠ অধ্যায়: মূল্য সংযোজন কর: চ্যালেঞ্জসমূহ** ৩৭
৬.১ মূসক প্রশাসনের কার্যাবলি ৩৭
৬.২ মূসক ক্যালকুলেশন ৩৮
৬.৩ মূসক রিফান্ড ৩৮
৬.৪ মূসক প্রশাসনে চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ ৩৮
৬.৫ মূসক অ্যাসেসমেন্টের ভিত্তি ৩৯
৬.৬ মূসক ভিত্তি এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা ৩৯
৬.৭ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের অনুপস্থিতিতে মূসক নির্ধারণ পদ্ধতি ৩৯
৬.৮ মূসক সেবার মান ৩৯
৬.৯ মূসক ফাঁকি এবং ইসিআর চালু ৪০
**সপ্তম অধ্যায়: কর সম্পর্কিত আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি** ৪১
৭.১ সেকশন/ধারা ৩০এ-এর অধীনে Disallowance ৪২
৭.২ আয়কর আইন, নিয়মের ক্ষেত্রে জ্ঞানের ঘাটতি ৪২
৭.৩ আপিল প্রক্রিয়ায় দাখিলকৃত কাগজপত্র নিরীক্ষার ক্ষেত্রে অনিয়ম/অসংগতি ৪২
৭.৪ আপিল কর্তৃপক্ষে কর কর্মকর্তা ৪৩
৭.৫ বিচারকদের সীমিত স্বাধীনতা ৪৩
৭.৬ আপিল রায়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ৪৩
৭.৭ হয়রানিযুক্ত মামলা প্রক্রিয়া ৪৩
**অষ্টম অধ্যায়: কর ন্যায়পাল একটি হারানো সুযোগ**
৮.১ নিয়োগ, যোগ্যতা ও চাকরিকাল বিধি ৪৪
৮.২ বাজেট ৪৪
৮.৩ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং লজিস্টিকস ৪৪
৮.৪ উদ্যোগ ৪৪
৮.৫ অর্জন ৪৪
৮.৬ কর ন্যায়পালের সীমাবদ্ধতা
**নবম অধ্যায়: উপসংহার ও সুপারিশসমূহ**
**পরিশিষ্ট** ৫২

# মুখবন্ধ

দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি কার্যকর ও টেকসই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কাজ করে যাচ্ছে। টিআইবি এ উদ্দেশ্য অর্জনে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা, অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর টিআইবি ধারাবাহিকভাবে গবেষণা ও গবেষণা-ভিত্তিক অ্যাডভোকেসি করে থাকে। জাতীয় সংসদ, নির্বাচন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয় এর ন্যায় প্রতিষ্ঠানের ওপর টিআইবি বিভিন্ন পর্যায়ে গবেষণা পরিচালনা করেছে এবং তার ভিত্তিতে কোন কোন ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় 'জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর): স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের উপায়' শীর্ষক গবেষণাটি পরিচালিত হয়। এই গবেষণার উদ্দেশ্য সরকার, নীতি-নির্ধারক ও এনবিআর যেন গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় উন্নতির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তবে রাজস্ব আয়-জিডিপি হারের মাপকাঠিতে বাংলাদেশের অগ্রগতি একদিকে যেমন নৈরাশ্যজনক অন্যদিকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মদক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট, সুপরিকল্পিত ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণ তেমনি সময়ের দাবি। এ প্রেক্ষিতে এই গবেষণায় উপস্থাপিত তথ্য, বিশ্লেষণ ও সুপরিশ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট যথার্থ গুরুত্ব বহন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

টিআইবির গবেষণার নীতি অনুযায়ী এই গবেষণা পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেছি। কিছু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমরা কর্তৃপক্ষের সক্রিয় সহায়তা পেয়েছি। প্রতিবেদনের প্রাথমিক খসড়ার ওপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃপক্ষের মূল্যবান মতামত সংগ্রহের জন্য একাধিকবার বোর্ড কার্যালয়ে বোর্ড চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সাথে টিআইবির গবেষকবৃন্দ ও কর্তৃপক্ষের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার জন্য আমরা তাদের নিকট কৃতজ্ঞ। গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে টিআইবি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ইতিবাচক পরিবর্তনে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে আগ্রহী এবং এক্ষেত্রে বোর্ড ও অন্য সকল স্টেকহোল্ডারের সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য।

এ গবেষণাটি এম. জাকির হোসেন খান এবং নীনা শামসুন্নাহার যৌথভাবে পরিচালনা করেছেন। বিভিন্ন পর্যায়ে টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের কর্মীদের মূল্যবান মতামত এবং পরামর্শ গবেষণাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

আমরা আন্তরিকতার সাথে এই গবেষণার তথ্য প্রদানে বিভিন্ন মুখ্য তথ্যদাতার মূল্যবান তথ্য, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, সুচিন্তিত নির্দেশনা, পরামর্শ ও মতামতের জন্য ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের অবদান এ গবেষণার মান ও পদ্ধতিগত উৎকর্ষতা ও তথ্য বিশ্লেষণে নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করেছে। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ও বর্তমান সদস্য এম. হাফিজউদ্দিন খান, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও বোর্ডের অন্যান্য সদস্যের আন্তরিক সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা ছাড়া এই গবেষণাটি সম্পন্ন করা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না।

আমরা আশা করছি সরকার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডার এ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও উপস্থাপিত সুপারিশমালা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। টিআইবি সংশ্লিষ্ট সকলের যে কোনো ধরনের সুচিন্তিত ও গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শকে স্বাগত জানাবে।

**ইফতেখারুজ্জামান**
*নির্বাহী পরিচালক*

প্রথম অধ্যায়

# প্রেক্ষাপট

## ১.১ ভূমিকা

বাংলাদেশের সংবিধানের ৮১(১) (ক) ধারা মতে, 'অর্থবিলের' আওতায় কোন কর আরোপ, নিয়ন্ত্রণ, রদবদল, মওকুফ বা রহিতকরণ বুঝায় এবং ৮৩ নং ধারা মতে, "সংসদের কোন আইনের দ্বারা বা কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন কর আরোপ বা সংগ্রহ করা যাইবে না"এবং ধারা ৮৪(১) মতে, সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল রাজস্ব সংযুক্ত তহবিলের অন্তর্ভুক্ত হইবে। বাংলাদেশে কর রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রধান অবদান রাখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এনবিআর বিভিন্ন প্রত্যক্ষ কর, যেমন আয়কর, উপহার (gift) কর, এবং পরোক্ষ কর, যেমন মূল্য সংযোজন কর (মূসক), আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক ও বিদেশ ভ্রমণ কর সংগ্রহ করার পাশাপাশি কর সংক্রান্ত নীতি, আইন ও বিধি প্রণয়ন এবং রাজস্ব বাজেট প্রণয়ন করে থাকে। এছাড়া এ প্রতিষ্ঠান আয়কর, আমদানি কর, মূসক, সম্পূরক এবং অন্যান্য কর রাজস্ব সংগ্রহে নিয়োজিত অধিদপ্তর/বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধান করে থাকে। একইসাথে এটি আন্তর্জাতিক সংস্থা বা দেশের সঙ্গে অনুদান, কর ও ঋণ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা, আপিল ও রিভিশন মামলার নিষ্পত্তি করা, কর হ্রাস বা অব্যাহতি প্রদান, চোরাচালান দমন, এবং আমদানি-রপ্তানি নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নীতি প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করে থাকে।[১]

চিত্র ১: বিভিন্ন দেশের কর -জিডিপি অনুপাত (২০০৮)

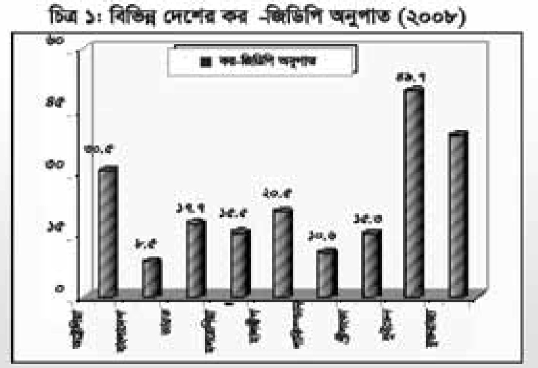


২০০৯-১০ অর্থবছরে সার্বিক রাজস্ব এবং কর রাজস্বে এনবিআর সংগৃহীত করের অবদান ছিল যথাক্রমে ৭৬.৭% এবং ৯৫.৪%। এছাড়া ২০০৯-১০ অর্থবছরে এনবিআর সংগৃহীত কর রাজস্বের পরিমাণ ৬২ হাজার ৪৫.৭৭ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৮.২%[২] এবং জানুয়ারি ২০১০ থেকে এনবিআর এর কর রাজস্ব আয়ের উপর জানুয়ারি ২০১১ পর্যন্ত আয়ের প্রবৃদ্ধির হার গড়ে ২৮.৪৪%, যা সার্বিকভাবে সন্তোষজনক। কিন্তু বাংলাদেশের সার্বিক কর-জিডিপি অনুপাত সার্কভুক্ত দেশগুলোর ভেতর এখনো সর্বনিম্ন। ২০০৯-১০ অর্থবছরে এনবিআর কর-জিডিপি ছিল মাত্র ৮.৯৬ শতাংশ। উল্লেখ্য, বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশ হিসাবে গড়তে সরকারের বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগামী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব জিডিপি'র ১৪.১% এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।[৩] এ প্রেক্ষাপটে, অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে, এনবিআরের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের সময়ে

চিত্র ২: কর-রাজস্ব এবং এনবিআর কর রাজস্ব ও জিডিপি অনুপাত

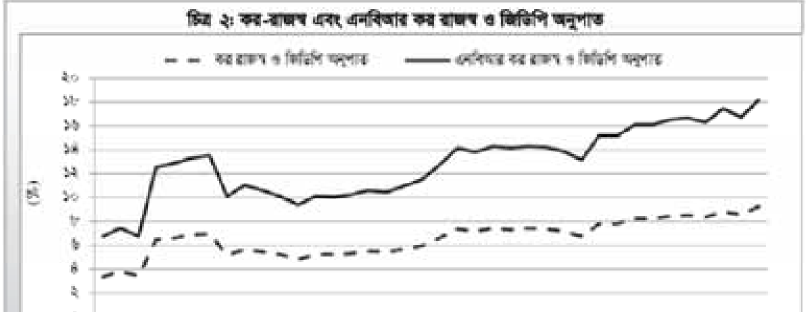


সূত্র: এনবিআর, ২০১০

[১] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইট: http://www.nbr-bd.org

[২] http://www.nbr-bd.org/statistics/data_as_on_240211.pdf, ৫ মার্চ ২০১১ তারিখে সংগৃহীত।

[৩] অর্থ মন্ত্রণালয়, মধ্যমেয়াদী রাজস্ব প্রক্ষেপণ (২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫), পৃষ্ঠা ২৬।

রাজস্ব সংগ্রহে ২০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের উচ্চাশার কথা শোনালেও অসম্ভব নয় এবং তিনি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের মধ্যে এ লক্ষ্যমাত্রায় পৌছার ব্যাপারে পুরোপুরি আস্থাবান; এবং তিনি এ লক্ষ্যমাত্রায় উপনীত হতে এনবিআরের কর্মদক্ষতা (Performance) বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।"[৪]

এ প্রেক্ষিতে এনবিআর কর সংগ্রহ ব্যবস্থার উন্নয়নে ইতোমধ্যে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে আয়কর, মূল্য সংযোজন কর (মূসক) এবং শুল্ক আইনের সংশোধন, 'বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি' আইন পাস, 'স্পট অ্যাসেসম্যান্ট' ও 'ওয়ান স্টপ' সেবা চালু, কর-মেলার আয়োজন, সর্বোচ্চ কর প্রদানকারীদের পুরস্কার ও 'কর-কার্ড' প্রদানের নীতি, ওয়েবসাইটে এমআইএস ও কর ক্যালকুলেটর চালু, কয়েকটি সরকারি সেবার (বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সংযোগ গ্রহণ, গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট নবায়ন) ক্ষেত্রে টিআইএন বাধ্যতামূলক করা, ভুয়া টিআইএনধারীদের জন্য আর্থিক শাস্তি, ইলেকট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার (ইসিআর) চালু, প্রত্যেক উপজেলায় ছোট আকারের মূসক ইউনিট স্থাপনের উদ্যোগ এবং ট্রাইবুনালে ১ জন বিচারককে সদস্য হিসাবে নিয়োগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এনবিআর কর্তৃক উপরোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও কর সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা প্রদানে দুর্নীতি, হয়রানি, কর আত্মসাৎ এবং কর-ফাঁকি এখনো বিদ্যমান। ২০১০-১১ অর্থবছরে কর-জিডিপি অনুপাতের সার্বিক গতি উর্ধ্বমুখী পরিলক্ষিত হলেও অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, "কর ব্যবস্থাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি এখন জাতীয় লজ্জা এবং সকল খাতসমূহ হতে দুর্নীতি রোধে সরকারি ব্যবস্থা এখনো অপ্রতুল"[৫]। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং দুর্নীতির চ্যালেঞ্জসমূহ নির্ধারণ ও তা উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করতেই এ গবেষণাটি পরিচালিত করা হয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) এর মতে দুর্নীতি হল 'ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার'। এছাড়াও জাতিসংঘের দুর্নীতি-বিরোধী নীতি ম্যানুয়াল (২০০৩) অনুযায়ী, দুর্নীতি হচ্ছে জনস্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার। ক্লিটগার্ড (১৯৯৮) দুর্নীতিকে একটি সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এটি হল C=M+D–A; সমীকরণে 'C' দুর্নীতি (Corruption), 'M' একচেটিয়া ক্ষমতা (Monopoly), 'D' একচ্ছত্র ক্ষমতা (Discretionary power), এবং 'A' জবাবদিহিতা (Accountability) নির্দেশ করে। উল্লেখ্য, একচ্ছত্র ক্ষমতা ভোগ করে এমন যে কোন কর্মচারী/কর্মকর্তা কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষমতাকালে জবাবদিহিতার অভাবে দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠতে পারে এবং অবাধ একচ্ছত্র ক্ষমতাই দুর্নীতির অন্যতম কারণ[৬]। রোজ-অ্যাকারম্যান (১৯৯৭) উল্লেখ করেন, "নিম্ন বেতন এবং অপর্যাপ্ত তদারকির এর কারণে সরকারি কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রে ঘুষ এক ধরনের প্রণোদনা হিসেবে কাজ করে"। টিআইবি পরিচালিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওপর পরিচালিত এ গবেষণায় রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকান্ড (Misappropriation), ঘুষের বিনিময়ে কর ফাঁকিতে সহায়তা এবং জোরপূর্বক অর্থ/ঘুষ আদায়ে (Extortion) এবং স্বজনপ্রীতি (Nepotism)[৭] দায়িত্বে অবহেলা, রাজস্ব আত্মসাৎ ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানিকে দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি এবং এর প্রকৃতিসমূহ চিহ্নিত করতে এ গবেষণায় বিভিন্ন পরিমাণগত ও গুণগত গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

## ১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

এনবিআর দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিষ্ঠান এবং এর সাফল্য ও ব্যর্থতার ওপর দেশের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা নির্ভর করে। টিআইবি'র ২০০৭ এবং ২০১০ সনে পরিচালিত 'সেবা খাতে দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপে', কর রেজিস্ট্রেশন এবং কর অ্যাসেসমেন্ট উভয় ক্ষেত্রে জরিপকৃত খানাসমূহ দুর্নীতি এবং হয়রানির শিকার হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে।[৮] টিআইবি প্রণীত 'সেবা খাতে দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় জাতীয় খানা জরিপ ২০১০' অনুসারে, ৫১.৩% খানার কোনো না কোনো সদস্য কর সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকালে দুর্নীতি, হয়রানি ও অনিয়মের শিকার হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। টিআইএন রেজিস্ট্রেশন ও আয়কর অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার খানার মধ্যে ৪৩.৯% খানা বাধ্যতামূলকভাবে ঘুষ প্রদান, ৩০.৩% হয়রানি ও ভুল অ্যাসেসমেন্ট, ১.৪% জটিল কর প্রদান পদ্ধতি, ৬.৪% কর কর্মচারীদের অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যবহার এবং ১৮% ঘুষ না দিলে সময়ক্ষেপণ, ফাইল হারিয়ে ফেলা, আইনের দুর্বোধ্য ভাষা, শুল্কায়নে সমস্যা, কর মামলা সংক্রান্ত

---

৪ দ্য ডেইলি স্টার, ৯ নভেম্বর ২০১০
৫ দ্য ডেইলি স্টার, ১ নভেম্বর ২০১০
৬ http://cvc.nic.in/vscvc/cvcspeeches/sp5nov01.pdf, পৃষ্ঠা ২
৭ http://www.u4.no/document/literature/u4_issue2_2005_revenue_administration.pdf
৮ www.ti-bangaldesh.org/activities/research

জটিলতা ইত্যাদি সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও, চট্টগ্রাম শুল্ক হাউজের ওপর টিআইবি (মাহমুদ এবং রোজেটি,২০০৮) পরিচালিত গবেষণায়, অবৈধভাবে বন্ডেড পণ্যের বিক্রি, পণ্য ছাড়ের ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণ, ভুল কান্ট্রি অব অরিজিন উল্লেখ করে রাজস্ব ফাঁকি, পিএসআই কোম্পানিসমূহের দুর্নীতি এবং এদের সাথে শুল্ক সংক্রান্ত কমকর্তাদের যোগসাজসে কর আত্মসাতের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সম্প্রতি, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি (বিডব্লিইসিসিআই) এর জরিপ ২০১০ অনুযায়ী, "৩৩% নারী উদ্যোক্তা কর সনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) পেতে দুর্নীতি বা ঘুষের শিকার হয়েছিল এছাড়াও, টিআইএন পেতে গড়ে ১,৯১৩ টাকা ঘুষ প্রদান করতে হয়েছিল"[৯]। গ্লোবাল কমপেটিটিভনেস রিপোর্ট ২০১০ অনুসারে, ৭৫% জরিপকৃত কর্পোরেট উত্তরদাতা বাংলাদেশের কর ব্যবস্থাকে জটিল এবং ৫৪% উত্তরদাতা শুল্কায়ন পদ্ধতি প্রায়ই ধীর ও বিরক্তিকর এবং ৪৯% উত্তরদাতা কর হারকে বিনিয়োগের জন্য কম প্রণোদনামূলক বলে উল্লেখ করেছেন।[১০] উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে বিশ্বব্যাংকের পরিচালিত অন্য এক গবেষণায়, বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের রাজস্ব প্রশাসনকে জটিল, বিভিন্ন ধরণের কর ছাড়, দ্বিধাযুক্ত, কর প্রদানের ক্ষেত্রে অস্বচ্ছ পদ্ধতি এবং কর পরিদর্শকদের অতিরিক্ত একচ্ছত্র ক্ষমতার উল্লেখ করা হয়েছে।[১১]

সম্প্রতি এনবিআর পরিচালিত এক জরিপের মাধ্যমে ১.৭৮ লাখ নতুন করদাতা হিসেবে বিভিন্ন ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য পেশাজীবীর সন্ধান পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে এক লাখ ৩৪ হাজার করদাতা ঢাকা এবং বাকিরা অন্য পাঁচটি বিভাগীয় শহরের অধিবাসী।[১২] উল্লেখ্য, বাংলাদেশের জনসংখ্যার মাত্র ১.৫% এর টিআইএন রয়েছে এবং প্রায় ২৭ লাখ টিআইএনধারীদের মধ্য থেকে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ নিয়মিত আয়কর রিটার্ন দেয় (এনবিআর, ২০১০)। বাংলাদেশে ২০০৭-০৮ এবং ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে মোট ৫৬,৮৪৫ জন ব্যক্তি ৯,৬৮১ কোটি কালো টাকা/অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করে। বিভিন্ন গবেষণায় কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে এনবিআর এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি, নিম্ন কর-জিডিপি অনুপাত এবং কর আত্মসাতের অবাধ সুযোগকে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখানো হয়েছে।[১৩]

## ১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য এনবিআর এর স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ এবং তার কারণ চিহ্নিত করে এ থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল:

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে নীতিগত, আইনগত, প্রাতিষ্ঠানিক এবং রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার চ্যালেঞ্জ এবং এর কারণ সুনির্দিষ্ট করা;
- বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির ক্ষেত্র এবং এর কারণ চিহ্নিত করা;
- করদাতাদের প্রদত্ত সেবার গুণগত মান যাচাই করা; এবং
- এনবিআর এর স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করা।

## ১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে পরিমাণগত ও গুণগত পদ্ধতিতেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মূলত করদাতা জরিপ, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং কেস স্টাডিসমূহ এ গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার সময়কাল হলো এপ্রিল ২০০৭ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১১।

### ১.৫.১ তথ্যের পরোক্ষ উৎস

কর সংক্রান্ত তথ্য, আইন, দলিল, এনবিআর হতে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ এবং উৎস সংক্রান্ত উপাত্ত, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত রাজস্ব ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং প্রবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে। অধিকন্তু,

[৯] দ্য ডেইলি স্টার, ১ নভেম্বর, ২০১০।

[১০] http://www.globalintegrity.org/documents/Global%20Integrity%20Index%202007.xls

[১১] J. Edgardo Campos and Sanjay Pradhan (ed.), The Many faces of Corruption: Tracking Vulnerabilities at the Sector Level, The World Bank, Washington, 2006, c".336|

[১২] http://www.bangladesh2day.com/newsfinance/2010/April/11/NBR-survey-spots-1.78-lakh-new-taxpayers.php

[১৩] অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি), রাজস্ব সংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ২০০৩।

জটিলতা ইত্যাদি সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও, চট্টগ্রাম শুল্ক হাউজের ওপর টিআইবি (মাহমুদ এবং রোজেটি,২০০৮) পরিচালিত গবেষণায়, অবৈধভাবে বন্ডেড পণ্যের বিক্রি, পণ্য ছাড়ের ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণ, ভুল কান্ট্রি অব অরিজিন উল্লেখ করে রাজস্ব ফাঁকি, পিএসআই কোম্পানিসমূহের দুর্নীতি এবং এদের সাথে শুল্ক সংক্রান্ত কমকর্তাদের যোগসাজসে কর আত্মসাতের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সম্প্রতি, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি (বিডব্লিইসিসিআই) এর জরিপ ২০১০ অনুযায়ী, "৩৩% নারী উদ্যোক্তা কর সনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) পেতে দুর্নীতি বা ঘুষের শিকার হয়েছিল এছাড়াও, টিআইএন পেতে গড়ে ১,৯১৩ টাকা ঘুষ প্রদান করতে হয়েছিল"[৯]। গ্লোবাল কমপেটিটিভনেস রিপোর্ট ২০১০ অনুসারে, ৭৫% জরিপকৃত কর্পোরেট উত্তরদাতা বাংলাদেশের কর ব্যবস্থাকে জটিল এবং ৫৪% উত্তরদাতা শুল্কায়ন পদ্ধতি প্রায়ই ধীর ও বিরক্তিকর এবং ৪৯% উত্তরদাতা কর হারকে বিনিয়োগের জন্য কম প্রণোদনামূলক বলে উল্লেখ করেছেন।[১০] উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে বিশ্বব্যাংকের পরিচালিত অন্য এক গবেষণায়, বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের রাজস্ব প্রশাসনকে জটিল, বিভিন্ন ধরণের কর ছাড়, দ্বিধাযুক্ত, কর প্রদানের ক্ষেত্রে অস্বচ্ছ পদ্ধতি এবং কর পরিদর্শকদের অতিরিক্ত একচ্ছত্র ক্ষমতার উল্লেখ করা হয়েছে।[১১]

সম্প্রতি এনবিআর পরিচালিত এক জরিপের মাধ্যমে ১.৭৮ লাখ নতুন করদাতা হিসেবে বিভিন্ন ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য পেশাজীবীর সন্ধান পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে এক লাখ ৩৪ হাজার করদাতা ঢাকা এবং বাকিরা অন্য পাঁচটি বিভাগীয় শহরের অধিবাসী।[১২] উল্লেখ্য, বাংলাদেশের জনসংখ্যার মাত্র ১.৫% এর টিআইএন রয়েছে এবং প্রায় ২৭ লাখ টিআইএনধারীদের মধ্য থেকে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ নিয়মিত আয়কর রিটার্ন দেয় (এনবিআর, ২০১০)। বাংলাদেশে ২০০৭-০৮ এবং ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে মোট ৫৬,৮৪৫ জন ব্যক্তি ৯,৬৮১ কোটি কালো টাকা/অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করে। বিভিন্ন গবেষণায় কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে এনবিআর এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি, নিম্ন কর-জিডিপি অনুপাত এবং কর আত্মসাতের অবাধ সুযোগকে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখানো হয়েছে।[১৩]

## ১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য এনবিআর এর স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ এবং তার কারণ চিহ্নিত করে এ থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল:

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে নীতিগত, আইনগত, প্রাতিষ্ঠানিক এবং রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার চ্যালেঞ্জ এবং এর কারণ সুনির্দিষ্ট করা;
- বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির ক্ষেত্র এবং এর কারণ চিহ্নিত করা;
- করদাতাদের প্রদত্ত সেবার গুণগত মান যাচাই করা; এবং
- এনবিআর এর স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করা।

## ১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে পরিমাণগত ও গুণগত পদ্ধতিতেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মূলত করদাতা জরিপ, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং কেস স্টাডিসমূহ এ গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার সময়কাল হলো এপ্রিল ২০০৭ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১১।

### ১.৫.১ তথ্যের পরোক্ষ উৎস

কর সংক্রান্ত তথ্য, আইন, দলিল, এনবিআর হতে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ এবং উৎস সংক্রান্ত উপাত্ত, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত রাজস্ব ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং প্রবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে। অধিকন্তু,

---

[৯] দ্য ডেইলি স্টার, ১ নভেম্বর, ২০১০।
[১০] http://www.globalintegrity.org/documents/Global%20Integrity%20Index%202007.xls
[১১] J. Edgardo Campos and Sanjay Pradhan (ed.), The Many faces of Corruption: Tracking Vulnerabilities at the Sector Level, The World Bank, Washington, 2006, c".336|
[১২] http://www.bangladesh2day.com/newsfinance/2010/April/11/NBR-survey-spots-1.78-lakh-new-taxpayers.php
[১৩] অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি), রাজস্ব সংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ২০০৩।

এনবিআরের কর ব্যবস্থা এবং নীতি সংক্রান্ত প্রকাশিত প্রতিবেদন, সাময়িকীর প্রবন্ধ, কেস স্টাডি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার, কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য যাচাই করে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

### ১.৫.২ তথ্যের প্রত্যক্ষ উৎস

**করদাতা/সেবাগ্রহীতা জরিপ**

করদাতা ৭১৩ জন ব্যক্তি এবং ব্যবসা কর প্রদানে সমর্থ প্রতিষ্ঠানের ওপর ২০ এপ্রিল হতে ২০ জুন, ২০০৮ এ সময়ের মধ্যে এনবিআরের কর অঞ্চল ও বিভিন্ন স্থানীয় অফিস হতে প্রদত্ত কর সংক্রান্ত সেবার মান যেমন, কর সনাক্তকরণ নম্বর রেজিস্ট্রেশন, কর অ্যাসেসমেন্ট ও প্রদান, কর প্রত্যর্পণ, কর সংক্রান্ত আপিল ও মামলা পরিচালনা বিষয়ে উত্তর জানার জন্য জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে। জরিপের উত্তরদাতা নির্বাচনে দ্বি-স্তর ভিত্তিক কোটা দৈবচয়ন (Quota Random Sampling) পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন বৈতনিক, ব্যক্তি, কর্পোরেট বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্বাচন করা হয়েছে। মূসক প্রদানকারী ৩১৮টি প্রতিষ্ঠানকে দৈবচয়িত পদ্ধতিতে বিভিন্ন ব্যবসায়িক কেন্দ্র হতে নির্বাচন করা হয়েছে। শুল্কায়ন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার তথ্য সংগ্রহের জন্য ঢাকা এবং চট্টগ্রামের ১৩৫টি সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টকে[১৪] নির্বাচন করে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

### ১.৫.৩ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

২০০৮ সালে করদাতাদের অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত জরিপের পর ২০১০ সালের এপ্রিলে করদাতাদের এনবিআর প্রদত্ত সেবার মান প্রদানের সার্বিক উন্নতি কতটুকু হয়েছে, তা যাচাইয়ের জন্য চারটি ফোকাস গ্রুপে আলোচনা করা হয়েছে। এসব আলোচনায় বিভিন্ন সুপারমার্কেটের প্রায় ৫০ জন ব্যবসায়ী অংশগ্রহণ করেছেন এবং কর কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সেবা নেয়ার সময় কি ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন তা উল্লেখ করেছেন।

### ১.৫.৪ মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং কেস স্টাডি

গুণগত পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তথ্যদাতার সাথে কার্যকর যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে প্রাক্তন কর ন্যায়পাল, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তা, আয়কর আইনজীবী, চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, শিক্ষাবিদ, গবেষক, সরকারি অর্থায়নে বিশেষজ্ঞ এবং ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। মুখ্য তথ্যদাতা কর আইন, কর প্রশাসন, ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার মাত্রা ও তার চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত তথ্য এবং এনবিআরে সুশাসন আনতে কিছু সুপারিশ করেছেন যা এ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জের ওপর কয়েকটি কেস স্টাডির উল্লেখ করা হয়েছে।

### ১.৫ গবেষণার চ্যালেঞ্জ

- এনবিআরে দুর্বল তথ্য ব্যবস্থাপনা, যেমন রাজস্ব সংগ্রহ ও তৎসম্পর্কিত এনবিআর ও সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত তথ্যের ক্ষেত্রে গড়মিল;
- ক্ষেত্রবিশেষে সংশ্লিষ্ট কর অফিস থেকে প্রয়োজনীয় উপাত্ত প্রদানে অস্বীকৃতি;
- খসড়া রিপোর্টের ওপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং এনবিআরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মতামত প্রদানে বিলম্ব হওয়ায় গবেষণাটি কাঙ্ক্ষিত সময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি।

### ১.৬ প্রতিবেদনের সংকলন

প্রথম অধ্যায়ে প্রেক্ষাপট অংশে ভূমিকা, দুর্নীতির সংজ্ঞা এবং কর ব্যবস্থা, গবেষণার যৌক্তিকতা, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি এবং গবেষণার চ্যালেঞ্জসমূহ; দ্বিতীয় অধ্যায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ; তৃতীয় অধ্যায়ে দুর্নীতি এবং হয়রানি রোধে আইনি এবং নীতিগত পর্যায়ে চ্যালেঞ্জসমূহ, সাফল্য; চতুর্থ অধ্যায়ে আয়কর বিভাগে চ্যালেঞ্জসমূহ; পঞ্চম অধ্যায়ে শুল্কায়ন কার্যক্রমে চ্যালেঞ্জসমূহ; ষষ্ঠ অধ্যায়ে মূসক কার্যক্রমে চ্যালেঞ্জসমূহ; সপ্তম অধ্যায়ে কর সংক্রান্ত আপিলের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ; অষ্টম অধ্যায়ে কর ন্যায়পাল এবং হারানো সুযোগ; এবং নবম অধ্যায়ে উপসংহার এবং সুপারিশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

---

[১৪] আমদানি এবং রপ্তানিকারকদের প্রতিনিধি হিসেবে শুল্কায়নের কাজ করে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়
# জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

একটি গতিশীল কর নীতি এবং দক্ষ কর সংগ্রহ পদ্ধতির মাধ্যমে একটি অর্থ-ব্যবস্থার স্বনির্ভরতা অর্জন সম্ভব। অ্যাডাম স্মিথের (১৭৭৬) মতে, "কর সংগ্রহের ৪টি মূলনীতি হল সুষম বন্টন, নিশ্চয়তা, সহজ কর প্রদান পদ্ধতি এবং স্বল্প খরচে কর আদায়"।[১৫] করের মাধ্যমে সংগৃহীত রাজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সরকারি দ্রব্য ও সেবা, অবকাঠামো এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের জন্য তহবিল গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর সংগ্রহ এবং তার ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত।

### ২.১ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কার্যক্রম

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ভারত বিভক্তি-উত্তর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত (বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত) পূর্ব পাকিস্তানে আয়কর বিভাগ কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন পরিচালিত হতো। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর এনবিআরের বোর্ড সদস্যদের মধ্য হতে একজনকে এনবিআরের চেয়ারম্যান[১৬] প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করার কথা থাকলেও এনবিআর বহির্ভূত অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব, বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয় এবং আইনের লঙ্ঘন করে ২০০৮-০৯ অর্থ বৎসর পর্যন্ত এ পদ্ধতিতে নিয়োগ করা হয়।[১৭] পরবর্তী পর্যায়ে ২০০৮ সালে সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করে এ আইন-বহির্ভূত নিয়োগ অব্যাহত রাখা হয়।[১৮]

**বক্স : ১ - কর প্রশাসনের ইতিহাস**

**ব্রিটেন**

১৭৮৯: নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যয় মেটাতে উইলিয়ম পিট কর্তৃক আয়কর প্রবর্তন

১৮০২: নেপোলিয়নের সাথে যুদ্ধের সমাপ্তির পর আয়কর ব্যবস্থার বিলোপ

১৮০৩: আয়কর ব্যবস্থার স্থায়ীভাবে পুন:প্রবর্তন

১৮৭৪: উভয় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের পূর্বে পদপ্রার্থী হিসেবে উইলিয়াম গ্লাডস্টোন এবং বেনজামিন ডিসরেলি আয়কর বিলোপের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন। আয়কর বৃটেনে এখনো অস্থায়ী কর, প্রতি বছর ৫ এপ্রিল এটা বিলোপ হয়, সংসদে পাশকৃত বার্ষিক অর্থ বিলের মাধ্যমে এটা পুন:প্রবর্তন হয়।

**যুক্তরাষ্ট্র**

১৮৬১: গৃহযুদ্ধ জনিত পুনর্বাসনে আব্রাহাম লিংকন কর্তৃক ৬০০ ডলার বা ততোধিক আয়ের ক্ষেত্রে ৩% হারে আয়কর প্রবর্তন

১৮৭২: প্রেসিডেন্ট ইউলিসেস গ্রান্ট কর্তৃক পুনরায় আয়কর প্রথা বাতিল

১৮৯৪: আয়কর ব্যবস্থার পুন:প্রবর্তন

১৮৯৫: বিভিন্ন স্টেটস এ সঠিক হারে আরোপ করা হয়নি, এ যুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্ট আয়কর ব্যবস্থা অসাংবিধানিক বলে রায় প্রদান করে

১৯৭৩: ইউএসএ'র সংবিধানের ১৬তম সংশোধন অনুসারে, "বিভিন্ন স্টেটসের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে করারোপ এবং কোনো জরিপ না করেই কংগ্রেসের যে কোনো উৎস হতে আয়কর আদায় বা সংগ্রহ করার ক্ষমতা রয়েছে।

**ভারত**

১৮৬০: জেমস উইলসন, ভারতের প্রথম অর্থমন্ত্রী (ইকনোমিষ্ট ম্যাগাজিন এবং স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংকেরও প্রতিষ্ঠাতা), কর্তৃক ৫ বছরের জন্য আয়করের প্রবর্তন করা হয়। কারণ, ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সরকারি ঋণ বৃদ্ধি পায়।

১৮৮৬: কৃষি আয়কে আইনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা এবং একে আয়কর হতে অব্যাহতি দেয়া হয়। এ অব্যাহতি এখন পর্যন্ত বিদ্যমান।

১৯১৮: সব কর আইনকে ঢেলে সাজানো হয়। সব ধরনের উৎসগুলোকে সংযুক্ত করে কর হার ধার্য করা হয়।

১৯২২: ভারতীয় আয়কর আইন কর প্রশাসনকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হস্তান্তর করে পূর্ববর্তী বছরের আয়ের এসেসমেন্টের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয় এবং অর্থ বিলের মাধ্যমে ঘোষিত হারকে অনুমোদন করা হয়।

১৯৬১: ১৯২২ সালে আইনের সহজ সংস্করণ, বর্তমান কর আইন পাশ করা হয়।

**বাংলাদেশ**

১৯৭২: স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ১৯২২ সালের আইন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। এটা জটিল ছিল না। সুতরাং কর আইনকে সহজীকরণের লক্ষ্যে সরকার একটি কমিশন গঠন করে। ১৯৮৪ সালের আয়কর অর্ডিন্যান্স ঐ কমিশনের সুপারিশসশূহ বিবেচনা করা হয়।

১৯৯১: মূসক আইন পাশ করা হয়।

২০১১: আয়কর, মুসক এবং শুল্ক আইনের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ।

---

[১৫] Smith A, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (selected ed, 1993), p 450.

[১৬] The National Board of Revenue Order, 1972, Presidential Order No.76

[১৭] পরিশিষ্ট ২

[১৮] বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার অতিরিক্ত সচিব বা সচিবকে রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে অনুমোদন দেয়; পূর্বে এনবিআরের সদস্যদের মধ্য হতে চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিধান ছিলো; কিন্তু সে আইন কখনো অনুসরণ করা হয় নি।

সাম্প্রতিককালে এনবিআর এর রাজস্ব আয় সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হলেও সংস্থাটির দক্ষতা বৃদ্ধিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্য-মেয়াদী বাজেট ফ্রেমওয়ার্ক রিপোর্টে বিভিন্ন ধরনের চলমান এবং ভবিষ্যৎ সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল; যেমন ১. এনবিআর কর্তৃক বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে কর-সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি; ২. এনবিআরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, মানবসম্পদ কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা; ৩. কর অডিট সেল স্থাপন; ৪. ঝুঁকিভিত্তিক অডিট ব্যবস্থার প্রবর্তন; ৫. মূসক এবং আয়কর ব্যবস্থাতে একক এলটিইউ প্রতিষ্ঠা; ৬. শুল্ক স্টাফদের কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যথার্থ আমদানি মূল্য নির্ধারণ; ৭. চোরাচালান বিরোধী কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন: ৮. কর ফাঁকি ও আয়কর এবং মূসক ভিত্তির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একাধিক ব্যক্তি/স্বাধীন অডিট ফার্মকে নিয়োগ করা; ৯. কর কর্মকর্তাদের একচ্ছত্র ক্ষমতা হ্রাস করা; ১০. কর তথ্য এবং গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা; ১১. চলমান রাজস্ব প্রশাসনে আধুনিকীকরণ প্রকল্প অব্যাহত রাখা; ১২. করদাতাদের জন্য পুরস্কার ও শাস্তি প্রথার প্রবর্তন। ইতোমধ্যে এনবিআর উপরোক্ত সুপারিশসমহের একাংশ বাস্তবায়ন করলেও এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর প্রদান পদ্ধতিকে সহজ করলেও এনবিআরের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং তা উত্তরণে বিশেষ করে দুর্নীতি রোধে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ অনুপস্থিত। এনবিআরের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতায় সার্বিক চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নে আলোচনা কর হল।

## ২.২ নীতিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধতাসমূহ

এনবিআরের একজন প্রাক্তন চেয়ারম্যানের[১৯] মতে (২০০৮), রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হল ১৯৮৪ সাল হতে মানবসম্পদের ঘাটতি বিভিন্ন জটিলতার দরুণ এনবিআর প্রয়োজনীয় স্টাফ নিয়োগ করতে পারে না; এবং ব্রিটিশ শাসনের সময়কাল থেকেই কর সংগ্রহকারীর ওপর কর দাতার অবিশ্বাস বা নির্ভরতার অভাব। কর সংগ্রহকারীরা সাধারণত মনে করেন, সব করদাতা কর আত্মসাৎ করে এবং মিথ্যা তথ্য প্রদান করে। এ ধরনের মনোভাব বা হয়রানির ভয় অনেক সময় কর ফাঁকি দিতে উৎসাহ যোগায়। কর ব্যবস্থা ও সম্ভাব্য করের পরিমাণের ওপর অপর্যাপ্ত গবেষণা এবং যথাযথ তথ্য না থাকায়, ক্ষেত্রবিশেষে স্বার্থান্বেষী মহল এ্যাসেসমেন্ট এবং কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনৈতিক হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পায়। যদিও কর ব্যবস্থার উন্নয়নে এনবিআর বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে তারপরও কর-জিডিপি অনুপাত কেন উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে না বা রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে এনবিআর কেন প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে সক্ষম হচ্ছেনা, এ অধ্যায়ে তা আলোচনা করা হল।

ফ্লো-চার্ট ১: নিম্ন কর-জিডিপি অনুপাতের কারণ ও প্রভাব

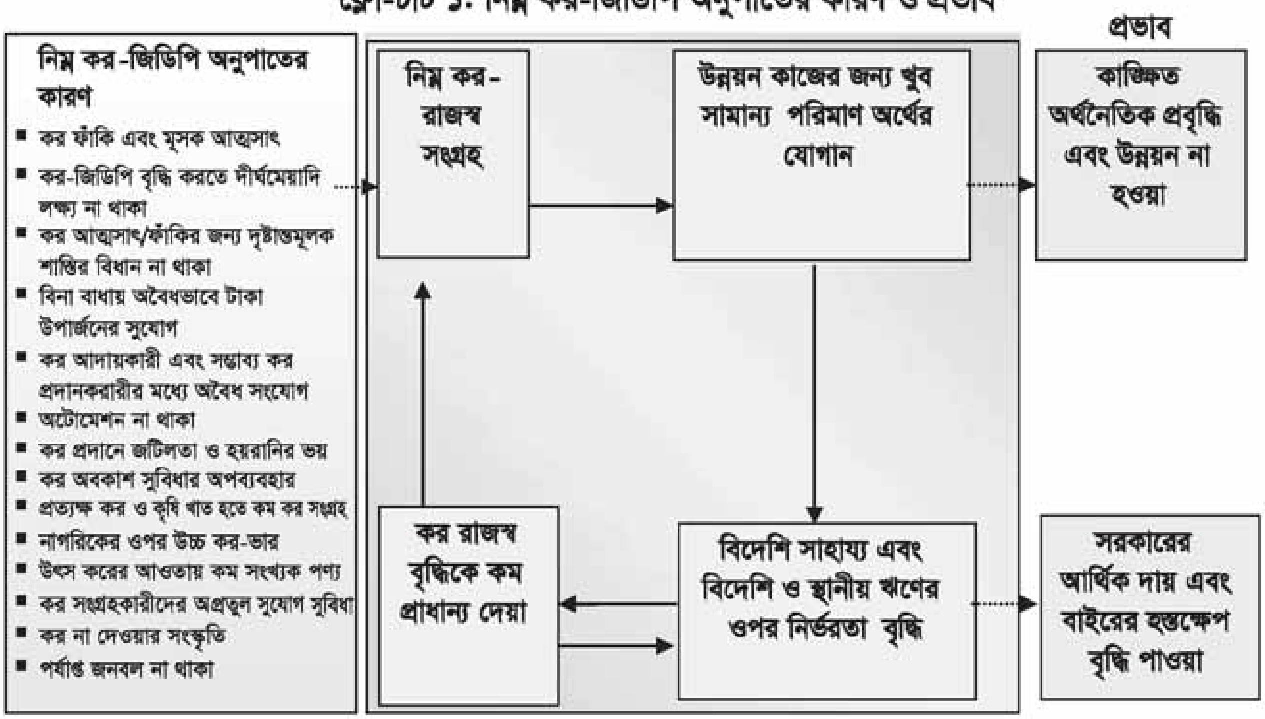


[১৯] জনাব আব্দুল মজিদ, ২০০৯।

### ২.২.১ নিম্ন কর-জিডিপি অনুপাত

একটি দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে দক্ষতার সূচক হল এর কর-জিডিপি অনুপাত। এনবিআর যদিও কর ব্যবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে, কিন্তু তারপরও কর-জিডিপি অনুপাত অনেক কম। ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেট বক্তব্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে, "করদাতারা সরকারি অফিসে বিভিন্ন জটিলতা এবং হয়রানির ভয়ে কর প্রদানে অনীহা প্রকাশ করে"। বর্তমানে ২৭ লক্ষ টিআইএনধারীদের মধ্যে মাত্র ৯ লক্ষ (১.৫ লক্ষ সরকারি কর্মকর্তাসহ) নিয়মিত কর রিটার্ন দাখিল করে। নিম্ন কর রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বাধা এবং রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে 'নিম্ন-কর-রাজস্ব ফাঁদ'। এর কারণ ও ফলাফল গবেষণার মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে (ফ্লোচার্ট-১)।

নিম্ন কর-জিডিপি হারের[২০] মূল কারণসমূহের মধ্যে কর ফাঁকি/আত্মসাৎ এবং কর আত্মসাৎ/ফাঁকির জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান না থাকা/শাস্তি না হওয়া, অপ্রতিরোধ্য/বিনা বাধায় কালো টাকা উপার্জনের সুযোগ এবং দেশের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনে সরকারের দূরদৃষ্টি না থাকা অন্যতম। অনেক ক্ষেত্রে কর নীতি ব্যাপক হলে  কর ফাঁকি, কর আত্মসাৎ এবং বড় ধরনের রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ বেশি হয়। করদাতা-বান্ধব আইন এবং প্রশাসন রাজস্ব সংগ্রহে সফলতা অর্জনে প্রভাব রাখে।

অন্যদিকে জটিল কর আইন ব্যাপক অনৈতিক আর্থিক সুবিধা নেয়ার পথ উন্মোচন করে।[২১] আইনগত জটিলতা ও ত্বরিৎ উদ্যোগের অভাবে সরকারের প্রায় ১২,০০০ কোটি টাকা কর রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হচ্ছেনা।[২২] ফলে, অর্থনীতিতে পর্যাপ্ত সম্পদ যোগ করা সম্ভব হচ্ছে না।[২৩] বিদেশি সহায়তার ওপর অতি নির্ভরতার সাথে সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, এনবিআর, সরকারি রেজিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট ও কর্পোরেট সেক্টরের মধ্যে অটোমেশন না থাকায় প্রকৃত রাজস্ব সংগ্রহ হচ্ছে না। করদাতা এবং কর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে অবৈধ সংযোগ, এনবিআরের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও উৎস করের আওতায় কম সংখ্যক পণ্য থাকা, কর অবকাশ সুবিধার অপব্যবহার, কর সংগ্রহকারীদের অপ্রতুল সুযোগ সুবিধা প্রদান, কর না দেওয়ার সংস্কৃতি এবং সুশাসনে দুর্বলতা সার্বিক কর-জিডিপির এ নিম্ন হারের জন্য দায়ী।

### ২.২.২ ব্যাপক কর ফাঁকি/আত্মসাৎ

স্লেইডার এবং অন্যান্য (২০০৮) এর মতে, বর্তমানে বাংলাদেশে অদৃশ্য অর্থনীতি বা অপ্রদর্শিত আয় বা কালো টাকার প্রাক্কলিত পরিমাণ গড়ে জিডিপির ৩৭ শতাংশ (বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে কালো অর্থনীতির পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে)। অন্যদিকে, হাসান (২০১০) এর মতে এর পরিমাণ ১০ হতে ৩৮.১ শতাংশ। তবে স্লাইডারের প্রাক্কলনটি অর্থের চাহিদা তত্ত্বের ভিত্তিতে করা হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণায় কালো বা ছায়া অর্থনীতির পরিমাণ প্রাক্কলন করা হলেও বাংলাদেশে কর ফাঁকি বা আত্মসাতের পরিমাণ সম্বন্ধে ১৯৭৯ সনে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত 'কর অনুসন্ধান কমিশন' এর চূড়ান্ত রিপোর্ট (১৯৭৯) মতে "The amount of revenue lost through evasion each year may very reasonably be estimated between 80 to 100 crores of taka"[২৪] পরবর্তীতে রাজস্ব সংস্কার কমিশন রিপোর্ট ২০০৩ বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ পর্যন্ত কর ফাঁকিজনিত রাজস্ব হারানোর প্রকৃত পরিমাণ সম্পর্কে কোন প্রাক্কলন এখন পর্যন্ত প্রকাশ করেনি। এ গবেষণায় কামাল (২০০৩)[২৫] এর আর্টিকেলে ব্যবহৃত সমীকরণ (৭) অনুসারে কর ফাঁকির পরিমাণ প্রাক্কলন

> **বক্স ২:** (২০০৯-১০ অর্থ বছরে বাংলাদেশে কর ফাঁকি/আত্মসাতের পরিমাণ ২১,০০০ কোটি টাকা)
>
> বর্তমান গবেষণায় কামাল (২০০৩) এর গবেষণায় ব্যবহৃত সমীকরণ অনুসারে, এনবিআর প্রদত্ত করের পরিমাণ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রদত্ত জিডিপি এবং জাতীয় আয়ের পরিমাণের তথ্যের ভিত্তিতে কর ফাঁকির পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে। সমীকরণটি হলো-
>
> কর ফাঁকি = ছায়া অর্থনীতির আকার x (সংগ্রহীত কর/মোট জাতীয় আয়)
>
> ছায়া অর্থনীতির পরিমাণ নির্ধারণে স্লেইডার, বুয়েন এবং কডিও (২০১০) বিশ্বের ১৬২টি দেশের ১৯৯৯-২০০৭ সনের অংশ হিসাবে ২০০৭ সালে বাংলাদেশের কালো অর্থনীতির পরিমাণ ৩৭ শতাংশ প্রাক্কলন করেন। তবে কালো অর্থনীতির পরিমাণ বিভিন্ন মডেল-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, এ গবেষণায় কর ফাঁকির পরিমাণ প্রাক্কলনে স্লোইডারের প্রাক্কলিত ছায়া বা কালো অর্থনীতির পরিমাণ ৩৭ শতাংশ ধরে বাংলাদেশে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে কর ফাঁকি/আত্মসাতের পরিমাণ প্রায় ২১,০০০ কোটি টাকা, যা এনবিআর সংগৃহীত কর রাজস্বের প্রায় ৩৩.৮% এবং মোট জাতীয় আয়ের ২.৮%। (সূত্রঃ গবেষক কর্তৃক প্রাক্কলনকৃত)

২০ মুখ্য তথ্যদাতাবৃন্দ এবং বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে 'নিম্ন কর-জিডিপি' হার এর প্রভাব তৈরি করা হয়েছে।

২১ করবিহীন গোপন আদান-প্রদানের কারণে বিভিন্ন অনৈতিক সুবিধা গ্রহণের পথ উন্মুক্ত হয়; যেমন যদি এক কোম্পানী হতে অন্য কোম্পানীর নিকট কোন পণ্য বিক্রয় করা হয় তবে তা বিক্রয় করের আওতায় পড়বে, তবে যদি একই পণ্য কোম্পানির এক শাখা হতে অন্য শাখায় স্থানান্তর হয়, তবে মূসক প্রয়োজ্য নয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ঘুষ না দিলে তার উপর মূসক ধার্য করা হয়।

২২ ২০১০-১১ অর্থ বছরে, বাজেট বক্তব্য, পৃ. ৮২

২৪ 'কর অনুসন্ধান কমিশন' এর চূড়ান্ত রিপোর্ট (১৯৭৯) পৃ. ১২০

২৫ Kemal M. Ali, 2003, Underground Economy and Tax Evasion in Pakistan: A Critical Evaluation, RESEARCH REPORT NO. 184, Staff Economist, Pakistan Institute of Development Economics, Islamabad

করা হয়েছে। যা, কর রাজস্বের প্রায় ৩৩.৮% এবং মোট জাতীয় আয়ের ২.৮%। উল্লেখ্য ২০০৯-১০ অর্থ বছরে এনবিআরের সংগৃহীত রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ছিল ৬২,১৫৭.১৮ কোটি এবং মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ৭৫৬,৮৭৫ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ছায়া অর্থনীতির[২৬] হিসাব মতে বাংলাদেশে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে কর ফাঁকি/আত্মসাতের পরিমাণ ২০,৯৮৩.৫ কোটি টাকা, যা এনবিআর সংগৃহীত কর পরিমাণ নির্ধারণে স্নেইডার, বুয়েন এবং ক্লডিও[২৭] (২০১০) এর গবেষণা প্রকাশের পর সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী কালো টাকার আকার জিডিপির ৪৮ হতে ৮২ শতাংশ বলে উল্লেখ করেছেন।[২৮]

## কর ফাঁকি/আত্মসাতের উপায়/পদ্ধতি

বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কর সংক্রান্ত সকল স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে অটোমেশন না হওয়ায় এবং ব্যবসায়িক পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রেই ম্যানুয়াল হওয়ায় কর ফাঁকি বা আত্মসাৎ অপ্রতিরোধ্যভাবে চলছে। এ গবেষণার আওতায় মুখ্য তথ্যদাতা ও কর কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার, আইনজীবী এবং সিএ ফার্মের প্রদত্ত তথ্য, বিভিন্ন দলিল ও কাগজপত্রের ভিত্তিতে ব্যক্তি বা কোম্পানির মাধ্যমে কিভাবে কর ফাঁকি/আত্মসাৎ করা হয় তা নিম্নে আলোকপাত করা হল:

### ক. ব্যক্তি আয়ের ক্ষেত্রে

- প্রকৃত আয় গোপন করা; সরকারি কর্মকর্তাদের অবৈধ আয় গোপন করা; বিদেশে বিশেষকরে কর-স্বর্গ সুবিধাপ্রাপ্ত দেশে অবৈধ অর্থ জমা এবং বিনিয়োগ ও সম্পদ ক্রয়;
- বেসরকারি চাকরিজীবিদের বেতনের একাংশ কর-অবকাশ সুবিধাভুক্ত আয়-ব্যয় (যেমন, চিকিৎসা/ভ্রমণ ভাতা, জ্বালানি খরচ ইত্যাদি) হিসেবে প্রদর্শন;
- আয়করভুক্ত নয় এমন পরিবারের সদস্য, নিকটাত্মীয়, বন্ধু এবং রাজনৈতিক সুবিধাভোগী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে প্লট, ফ্ল্যাট, সঞ্চয়পত্র, বন্ড, শেয়ার ব্যবসা, অন্য ব্যবসায় বিনিয়োগ;
- কর-যোগ্য আয়কে গোপন করার জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ, কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যবসায় বিনিয়োগ, কর-যোগ্য আয়কে সামাজিক বা কর-মুক্ত সেবা খাতে খরচ হিসাবে প্রদর্শন; এবং আয়কর রিটার্ন ফরমে ব্যক্তিগত সব ব্যাংকের হিসাবের উল্লেখ না করা;

### খ. পেশাগত উপার্জন প্রদর্শনের ক্ষেত্রে

- কর অ্যাসেসম্যান্ট ফরমে প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে কম সংখ্যক সেবা গ্রহণকারী/ক্লায়েন্ট দেখানো;
- কনসালট্যান্ট, শিল্পী বা এ ধরনের ব্যক্তির সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পাদনকৃত চুক্তিতে সম্মানী/ফি'র পরিমাণ প্রকৃত ফি'র চেয়ে কম দেখানো:
- ক্রেতা/সেবাগ্রহণকারীর থেকে অর্থ প্রাপ্তির রশিদ/ক্যাশ মেমো না দেওয়া;
- আইনের ফাঁক এবং কর কর্মকর্তাদের সহায়তায় কর ফাঁকি;
- নির্দিষ্ট কোম্পানি বা অন্য কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে নগদ অর্থ বা দ্রব্য/সম্পদ কর রিটার্নে উপহার হিসেবে দেখানো;
- আমদানি, বিদেশে বিভিন্ন মেলা এবং বিদেশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থ পাচার;
- শহর এলাকায় কমিউনিটি সেন্টার, হোটেল রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র দোকান, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, বৃহৎ শিল্প এবং বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকদের প্রকৃত আয় অডিট ফার্মের সহায়তায় গোপন করা।

### গ. কর্পোরেট বা ব্যবসা ক্ষেত্রে

- দ্রব্য বা সেবার অতিরিক্ত উৎপাদন/পরিচালন ব্যয়, ভুয়া ভাউচার বা নিম্ন বিক্রয়মূল্য এবং পাওনা টাকার নিম্ন পরিমাণ প্রদর্শন;
- কম পরিমাণে কর প্রদানের জন্য পৃথক লেজার হিসাব বই, অর্থ প্রাপ্তি রশিদ এবং খরচের খাতা ব্যবহার;
- অবকাঠামো/ব্যবসা/কোম্পানির করযোগ্য লাভ বা আয়কে কর-অবকাশ সুবিধাপ্রাপ্ত খাতে বা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ বা ভুয়া উন্নয়ন খরচ হিসাবে দেখিয়ে ব্যক্তিগত কাজে ব্যয়;

---

২৬ ছায়া অর্থনীতির আওতায় পণ্য এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান (যেমন, এনবিআর) এর নিকট ব্যবসায়ী কর্তৃক বাজার-ভিত্তিক বৈধ উৎপাদন আয়কর, মূল্য সংযোজন বা অন্যান্য কর ফাঁকি দেয়ার উদ্দেশ্যে গোপন করাকে বুঝায়। এছাড়াও, নিম্নের যে কোন উদ্দেশ্যে আয় গোপন করাও ছায়া অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত; যেমন, ক) সামাজিক নিরাপত্তামূলক খাতের জন্য প্রদত্ত অর্থ প্রদান না করা; খ) শ্রম বাজারের নির্দিষ্ট কয়েকটি মানদন্ড রা না করা, যেমন ন্যূনতম বেতন, সর্বোচ্চ কর্মঘন্টা, নিরাপদ মানদন্ড; এবং গ) নির্দিষ্ট প্রশাসনিক পদ্ধতিসমূহ, যেমন পরিসংখ্যানিক প্রশ্নাবলী বা প্রশাসনিক ফরমসমূহ না মানা।

২৭ www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/LatestResearch2010/SHADOWECONOMIES_June8_2010_FinalVersion.pdf

২৮ দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ জুন, ২০১১

- কর অব্যাহতি পাওয়ার লক্ষ্যে প্রকৃতপক্ষে না হলেও ২০ শতাংশ বা তার চেয়ে বেশি কোম্পানির লভ্যাংশ ঘোষণা;
- কাস্টমস বন্ডের আওতায় দ্রব্য আমদানি করে রফতানি দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার না করে গোপনে স্থানীয় বাজারে বিক্রি;
- করযোগ্য আয়কে গোপন করার জন্য ব্যবসা বা কোম্পানির নামে ব্যাংক ঋণ গ্রহণ;
- অতিরিক্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির নামে অবৈধ অর্থ পাচার;
- কোনো ক্রয় বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তিতে প্রকৃত ব্যয়ের চেয়ে কম ব্যয় দেখানো;
- মূসক এবং আয়কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য উৎপাদিত দ্রব্য এবং বিক্রয়কৃত দ্রব্যের একটা অংশ অযোগ্য হিসাবে দেখানো;
- উৎপাদন/উপকরণ/যন্ত্রপাতি এবং আনুষঙ্গিক কাঁচামালের দাম বেশি করে দেখানো (ক্লিনিক এবং হাসপাতাল ইত্যাদির ক্ষেত্রে)।

**ঘ. সেবার ক্ষেত্রে**

- বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিকে প্রদত্ত কমিশন সুবিধাকে ঐ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ব্যয় হিসাবে দেখানো;
- প্রদত্ত সেবা বা পণ্যের সংখ্যা এবং ফি কম করে দেখানো, যেমন ডাক্তার, উকিল এবং কনসালটেন্ট ফি ইত্যাদি;
- অনুদান বাবদ অর্থের আইনসঙ্গত কোনো রশিদ প্রদান না করা।

উল্লেখ্য যে, কোম্পানি পর্যায়ে কর হার অনেক বেশি (কর বিশেষজ্ঞ, ২০১১)। ব্যক্তি পর্যায়ে করদাতাদের কর প্রদান করার পর খুব বেশি সঞ্চয় থাকিলে তা ভোগ বিলাসে ব্যবহার হয়, পক্ষান্তরে কোম্পানি পর্যায়ের করদাতাদের কর প্রদান করার পর সঞ্চিত অর্থ অনেকাংশে কল কারখানা নির্মাণ/সম্প্রসারণে/শিল্প বিনিয়োগে ব্যবহৃত হয়, যা দেশে কর্ম সংস্থান সৃষ্টি ছাড়াও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। কোম্পানি পর্যায়ের করদাতাদের কর হার যৌক্তিক পর্যায়ে কমালে কর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা হ্রাস পাবে বলে বিশেষজ্ঞবৃন্দ মনে করেন। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে আয়কর রাজস্বের মাত্র ৫৫.৬১% কোম্পানি হতে আদায় হয়[২৯]; এক্ষেত্রে কর ফাঁকির পরিমাণ অনেক বেশি বলে উল্লেখ করেছেন কর কর্মকর্তাবৃন্দ।

করারোপের মূল নীতি হল নাগরিকের ওপর করভার সুষম হারে আরোপ করা। কর ফাঁকির ফলে সে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং এর ফলে সাধারণত সৎ নাগরিক/করদাতার ওপর বর্তায়; ফলে সম্পদ ব্যাপক হারে পূঞ্জীভূত হয়[৩০]। এ গবেষণায় কর ফাঁকির একাধিক কারণ চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কর অনুসন্ধান কমিশন ১৯৭৯ এর চূড়ান্ত প্রতিবেদনে ফাঁকির কারণ চিহ্নিত করতে জরিপকৃত একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক উল্লেখ করেছেন যে, "কোন দেশের কর ব্যবস্থায় অযৌক্তিক উচ্চ কর হার যা অনেকাংশে শাস্তিমূলক এবং কর কর্মকর্তাদের প্রতি অবিশ্বাস এবং আস্থাহীনতা থাকলেই কর ফাঁকির ঘটনা ঘটবেই"[৩১]। রাজস্ব সংস্কার কমিশন রিপোর্ট ২০০৩ এ উচ্চ কর হারকে কর ফাঁকির জন্য দায়ী করে তা কমানোর পরামর্শ দেয়া হয়েছে[৩২]। এ প্রেক্ষাপটে বিশেষজ্ঞবৃন্দ মনে করেন যে, কর ফাঁকি রাষ্ট্রীয় আইনের সরাসরি লংঘন এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ[৩৩]। রাজস্ব সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট (২০০৩) এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, "কর ফাঁকিতে জড়িত ব্যক্তিরা কর প্রদান না করতে হতে পারে এ ভেবে কর দেন না। কারণ, কর ফাঁকির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সততা খুব কমই প্রতিষ্ঠিত হয়; এরা সব ক্ষেত্রেই ঝুঁকিপূর্ণ এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করেই তাদের আয়ের পরিমাণ প্রকাশ করে"[৩৪]। উল্লেখ্য কর ফাঁকি এবং কালো অর্থের সংযোগ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসু উল্লেখ করছেন যে, "Black money and tax evasion sustain in a symbiosis[৩৫]…Although black money may not always originate in tax evasion, all tax-evaded incomes constitute black money"[৩৬]।

---

[২৯] এনবিআর এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৮-০৯, সারণী ২৫ (ক)
[৩০] রাজস্ব সংস্কার কমিশন রিপোর্ট ২০০৩, প্যারা ২.২, পৃ.১৮৫
[৩১] প্যারা ১৩, পৃ. ১২১
[৩২] প্যারা ১২, পৃ. ১২১
[৩৩] প্যারা ৫২, পৃ. ১৩৭
[৩৪] প্যারা ৪.৫, পৃ. ১৯৪
[৩৫] প্রাগুক্ত
[৩৬] প্যারা ২.১, পৃ.১৮৫

### ২.২.৩ অর্থহীন কালো অর্থ

২০১১-১২ অর্থ বছরের বাজেটে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ পুনরায় প্রদান করা হয়। বিশেষজ্ঞগণ এ ধরনের সুযোগকে অনৈতিক এবং সৎ করদাতাদের জন্য শাস্তি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এ প্রেক্ষাপটে জানা দরকার যে, কোন যুক্তিতে বারবার এ সুযোগ দেয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, 'কালো টাকা বা অবৈধ উৎস হতে আয়' এবং 'বৈধ এবং অবৈধ উভয় উৎস হতে উপার্জিত করবিহীন অর্থ' বা আয়কর অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৪ এর সেকশন ১৯খ এ 'আইনগত অপ্রদর্শিত আয়' এবং 'অবৈধ আয়' দুটোর মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন। বিশেষ করে যখন আয়ের উৎস স্পষ্ট করা থাকে না সেক্ষেত্রে কালো টাকার মালিকদের 'বিশ্বাসের' উপর ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

এনবিআরের পক্ষ থেকে গত ১৯৭৬-২০১০ পর্যন্ত কালো টাকা সাদা করার প্রকৃত পরিমাণ সম্বন্ধে আনুষ্ঠানিক কোন হিসাব প্রদান করা হয়নি। এ প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে কালো টাকা সাদা করার বিভিন্ন হিসাব পাওয়া যায় এবং সর্বশেষ দৈনিক আমাদের সময়ে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে জানানো হয় যে, গত ৩৮ বছরে মোট ২৪,৯২৪ কোটি কালো টাকা সাদা করা হয়েছে। এর মধ্যে নিয়মিত আইনের সুযোগ নিয়ে কালো টাকা সাদা করা হয়েছে মাত্র ৯২৪ কোটি টাকা, বাকি ২৪ হাজার কোটি টাকা সাদা করা হয়েছে প্রজ্ঞাপন জারি করে। তবে, শুধুমাত্র ২০০৭, ২০০৮ সালে সবচেয়ে বেশি কালো টাকা সাদা করা হয় প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকা। সর্বশেষ, ২০০৯-১০ অর্থ বছরে আয়কর আইনের ১৯এর বিভিন্ন ধারায় (১৯এ, ১৯এএ, ১৯এএএ, ১৯বিবিবিবি) কালো টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে মোট ১ হাজার ৯২৩ জন সাদা করেছেন বিভিন্ন খাতে যেমন, নতুন শিল্প, অবকাঠামো তৈরি, পুরনো শিল্পের আধুনিকায়ন, সম্প্রসারণ[৩৭]। তবে, আয়কর আইনের এই ধারাগুলোর মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করার পদ্ধতি প্রথম বাতিল করা হয় ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়। উল্লেখ্য, ১৯৭৬ সনে কর কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ১৯৭১ সাল থেকে ৭৬ সাল পর্যন্ত অর্জিত কালো টাকা প্রথম বিনা প্রশ্নে নিয়মিত হারে করারোপের মাধ্যমে সাদা করার সুযোগ দেয়া হয়। ১৯৭৬ সন হতে সর্বশেষ ২০১০ অর্থ বছর পর্যন্ত কালো টাকা সাদা করার ক্ষেত্রে কর হার ৫-২০ শতাংশের মধ্যেই ছিলো (সারণি ১)। তবে, ২০০৭ সালে কালো টাকা সাদা করার পদ্ধতি প্রথম বাতিল করা হয়।

**সারণি ১: বিভিন্ন অর্থ বছরে কালো টাকার সাদা করার ওপর কর হার**

| সন | কর হার | পদ্ধতি |
|---|---|---|
| ১৯৭৬ | নিয়মিত হারে করারোপ করে টাকা সাদা করা হয় | কর কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৭১ সাল থেকে ৭৬ সাল পর্যন্ত অর্জিত কালো টাকা বিনা প্রশ্নে সাদা করার সুযোগ দেয়া হয়। |
| ১৯৮৬ | মোট টাকার ওপর ১০ শতাংশ করারোপ | প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রথম বিশেষ কর হার নির্ধারণ |
| ১৯৮৭ | ২০ শতাংশ | |
| ১৯৮৮ | ২০ শতাংশ | |
| ১৯৮৯ | ২০ শতাংশ | |
| ২০০০ | ১০ শতাংশ | |
| ২০০৫ | ৫ শতাংশ | |
| ২০০৬ | ৫ শতাংশ | |
| ২০০৭ | মোট আয়ের ওপর কালো টাকা সাদা করার পদ্ধতি প্রথম বাতিল করা হয় আরো ৫ শতাংশ ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়। | |
| ২০০৮ | ৭ শতাংশ | |
| ২০০৯ | ১০ শতাংশ | |
| ২০১০ | ১০ শতাংশ | |

[৩৭] বিডিনিউজ২৪.কম, ১৩ জুলাই, ২০১০

- ২০০৭ এর পর অবকাঠামো উন্নয়ন বন্ডের মাধ্যমে ও চলতি বাজেটে ট্রেজারি বন্ড ক্রয়ের মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়া হয় । তবে ২০১০ সালের অবকাঠামো উন্নয়ন বন্ডে এ পর্যন্ত কোন বিনিয়োগ হয়নি ।

সূত্র : রাজস্ব সংস্কার কমিশন রিপোর্ট, বাজেট বক্তৃতা ২০১০-১১

অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসু ভারতে কালো অর্থের আকার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উচ্চ কর হারের প্রভাব সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, "With the reduction of income tax rates the aggressiveness of black money would come to a check. But there is no proof of tax compliance except in the definitional sense due to lower tax rates" (রাজস্ব সংস্কার কমিশন রিপোর্ট ২০০৩) । বাংলাদেশের ক্ষেত্রে রাজস্ব সংস্কার কমিশন রিপোর্ট ২০০৩ মতে কালো অর্থের উৎসসমূহ সম্পর্কে বলা হয়, "কালো টাকা সৃষ্টির সাধারণ কারণ হলো অযৌক্তিক কর কাঠামো, কর আইনের জটিলতা, অদক্ষতা, দুর্নীতি এবং কর স্টাফদের যথার্থ প্রশিক্ষণের অভাব এবং সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক কাঠামো, ক্লায়েন্টালিজম এবং সৎভাবে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে অন্যতম"[৩৮] । সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়ার ধারাবহিকতায় সর্বশেষ ২০১১-১২ অর্থ বছরেও ১০% হারে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ বহাল রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে । ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে যে কোনো ধরনের অপ্রদর্শিত আয় কিছু নতুন শিল্প বা ভৌত অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এবং পুঁজিবাজারে নিবন্ধিত কোম্পানির শেয়ার কেনার ক্ষেত্রে ১০% কর দিয়ে তা বৈধ করার সুযোগ দেওয়া হয়[৩৯] । কালো টাকা সাদা করার অব্যাহত এ সুযোগ যে সমর্থনযোগ্য নয়, তার কারণসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল:

- **সংবিধান ও কালো টাকা উপার্জনের সুযোগ**: বাংলাদেশ সংবিধানের ২০(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবে না" । সরকার কর্তৃক কালো বা অপ্রদর্শিত অর্থ উপার্জনকারীদের তুলনামূলকভাবে কর প্রদানকারীর চেয়ে কম হারে নিয়মিত কর প্রদানের সুযোগ সংবিধানের এ ধারার সুস্পষ্ট লংঘন ।
- **করনীতি এবং নৈতিক অবস্থান**: বৈধ আয় উপার্জনকারীদের চেয়ে কম হারে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ প্রদান যে কোন যুক্তিতে করারোপের নীতিবিরোধী । একইসাথে এটা নৈতিকভাবেও অগ্রহণযোগ্য ।
- **সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি:** সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদ সকল নাগরিকের জন্য সমানাধিকার নিশ্চিত করেছে অথচ, অবৈধ উপার্জনকারীকে বা কালো আয় সাদা করার সম-সুযোগ প্রদান সমাজে অসমতা সৃষ্টি করছে । সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদ সমাজের অনগ্রসর বা সুবিধাবঞ্চিত নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে উচ্চ আয়ের জনগোষ্ঠীর চেয়ে বেশি সুবিধা প্রদানের কথা বলা হয়েছে, কালো টাকা উপার্জনকারীদের নয় । এ ধরণের সুযোগের ফলে "যখন পেশাজীবি এবং ব্যবসায়ীদের একটি বড় অংশ কর আওতার বাইরে থাকে, তখন নিম্ন আয়কর প্রদানকারী বেতনভুক্ত মানুষের বড় অংশ মনে করে যে, সরকার তাদের সাথে প্রতারণা করেছে"[৪০] ।
- **অর্থনীতির ওপর অনৈতিক অর্থের প্রভাব:** কালো টাকার মালিকরা রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারকদের সাথে রাজনৈতিক বা ব্যবসায়িকভাবে যুক্ত থাকায় তারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ প্রণয়ন এবং এর প্রয়োগে প্রভাব বিস্তার করে । অনেক ক্ষেত্রে বাজেট প্রস্তাবে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়ার জন্য নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অবৈধ সুবিধা প্রদানে বা রাজনৈতিক নেতাদের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করার অভিযোগ আছে । উল্লেখ্য, "মজুতদার, কালোবাজারি এবং চোরাকারবারিরা তাদের অবৈধ ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে কালো টাকা ব্যবহার করে এবং এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক নীতিসমূহকে অকার্যকর করছে"[৪১] ।

চিত্র ৩: কালো টাকা সাদা করার ক্ষেত্রে সুবিধাভোগী (২০ ০৭-০৮ অর্থ বছর)

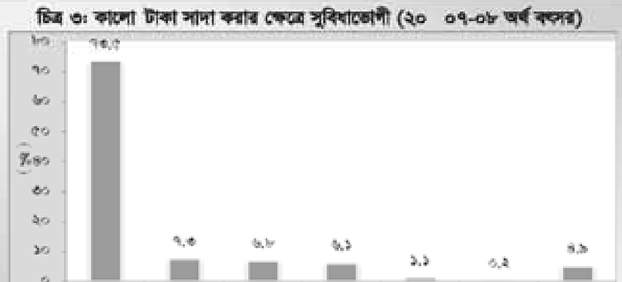


সূত্র: ডেইলি স্টার, ৩ জুলাই ২০১০ এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত

---

৩৮ প্যারা ৪.২, পৃ. ১৯২

৩৯ বাংলাদেশ সরকারের ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতা, পৃ. ৮৩

৪০ রাজস্ব সংস্কার কমিশন রিপোর্ট ২০০৩, পৃ.১৯৪

৪১ প্যারা ২.২, পৃ.১৮৫

- **কালো অর্থের উৎপাদনশীলতা:** সরকার বিনিয়োগ বৃদ্ধির নামে কালো অর্থ সাদা করার সুযোগ দিলেও বিভিন্ন সময়ে অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞবৃন্দ এর উৎপাদনশীলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। উল্লেখ্য ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে যথাক্রমে ৮,৮৯৫.৩৫ কোটি কালো টাকা সাদা করা হয় এবং সরকার কর আদায় করে ৮০৩.২৪ কোটি টাকা, ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ৭৮৭.৬৮ কোটি কালো টাকা হতে ১০৮.০৮ কোটি টাকা কর সংগ্রহ করা হয়। সর্বশেষ, ২০০৯-১০ অর্থ বছরে মাত্র ১,৯২৩ জন ব্যক্তি (সর্বোচ্চ সংখ্যক ব্যবসায়ী) প্রায় ৯২২.৯৯ কোটি টাকা অপ্রদর্শিত আয় বিনিয়োগের মাধ্যমে মাত্র ১২১.৩ কোটি টাকা কর প্রদান করে যা সার্বিক রাজস্বের মাত্র ০.২ শতাংশ। জুলাই ২০০৯ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে ১) কতিপয় নতুন শিল্প অথবা এই শিল্পের মেরামত, আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ এবং ভৌত অবকাঠামো খাতে; এবং ২) পুঁজিবাজারে নিবন্ধিত কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ে বিনিয়োগকৃত অপ্রদর্শিত অর্থের ওপর ১০ শতাংশ হারে কর প্রদান সাপেক্ষে বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়ার বিধান করা হয় (২০০৯-১০ অর্থ বছর)। কিন্তু রাজস্ব সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট (২০০৩) মতে, " ১৯৭৬-৭৭ অর্থ বছর হতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ (কালো) আয় বৈধ অর্থনৈতিক চ্যানেলে বিনিয়োগের সুবিধা (Carrots) দেয়া হয়েছে, কিন্তু কর প্রশাসনের অদক্ষতা এবং দুর্নীতির ফলে শাস্তির (stick) প্রয়োগ (বৈধ এবং অবৈধ উৎস হতে উপার্জিত গোপন আয় বাজেয়াপ্ত করা) না হওয়ায় খুব কম সাফল্যই অর্জিত হয়েছে "[৪২]।

  কালো টাকার বাস্তব ফলাফল যে নেতিবাচক তা সম্বন্ধে একই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "করবহির্ভূত কালো অর্থ থেকে তার প্রান্তিক উপযোগ (ভোক্তার সন্তুষ্টি) কমায় এবং তা অনুপাদনশীল খাতেই ব্যবহার হয়। কালো টাকা উৎপাদনশীল বিনিয়োগের সুবিধা হতে রাষ্ট্রকে বঞ্চিত করে এবং অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়"[৪৩]। বর্তমানে বিনিয়োগের মন্দাবস্থায় দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন বৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতি তারই প্রমাণ। উল্লেখ্য, একাধিক বাজার বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ শেয়ার বাজার থেকে লুণ্ঠনকৃত কালো টাকা বিদেশে পাচারের সাথে বৈদেশিক মুদ্রার মূল্যবৃদ্ধির সাথে সম্পর্কের কথা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছেন।

- **কালো টাকা এবং পুঁজি বাজার:** ২০০৯-১০ অর্থবছরে পুঁজিবাজারে ১০ শতাংশ আয়কর পরিশোধের মাধ্যমে কালো টাকা বিনিয়োগের সুযোগ দেয়া হয় ১ বছরের জন্য। ২০১১-১২ অর্থ বছরের বাজেটে পুঁজি বাজারে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ বন্ধ করে দেয়ায় সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী রাজনীতিক, যাদের কারো কারো বিরুদ্ধে পুঁজি বাজার কেলেংকারির সাথে জড়িত আছে বলে তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, সংসদের স্থায়ী কমিটিকে ব্যবহার করে সে সুযোগ অব্যাহত রাখার কথা বলছেন। প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, এ সুযোগ কাদের স্বার্থে? ইতোমধ্যে অধিকাংশ বিনিয়োগকারী কালো অর্থ দূরে থাক, মূলধন হারিয়ে পথে বসেছে; তাহলে কারা এ সুযোগটি গ্রহণ করবেন।

- **বিদেশে কালো অর্থ পাচার:** সাধারণভাবে বলা হয় কর ব্যবস্থায় কালো বা অবৈধ অর্থ উপার্জনের সুযোগ প্রদান না করলে সে অর্থ বাইরে চলে যায়। ইতোমধ্যে উপরের বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ ধরনের কালো অর্থ উপার্জনকারীদের অর্থ বাস্তবে খুব কমই উৎপাদনশীল বিনিয়োগে আসে। এক্ষেত্রে বৈধ উৎস হতে উপার্জিত অপ্রদর্শিত আয়ের অংশ ক্ষেত্রবিশেষে শিল্প বিনিয়োগে আসে, কিন্তু অবৈধ অর্থের প্রায় পুরোটা পাচার হয়ে যায়। রাজস্ব সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট ২০০৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, "কালো টাকা নিরাপদ স্বর্গ হিসাবে বিদেশী ব্যাংকগুলোতে জমা হওয়ায় মূলধন পাচার হয়ে যায় এবং অর্থনীতির স্থায়ী ক্ষতি (haemorrhage) সাধন করে। যার ফলে দেশ মূল্যবান বিদেশি মুদ্রা হারায়"[৪৪]।

- **কালো টাকা এবং দুর্নীতির বিস্তার:** ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেটে বাংলাদেশ ভৌত অবকাঠামো অর্থায়ন তহবিলের ইস্যুকৃত বন্ডে দশভাগ কর দিয়ে অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ প্রকারান্তরে কালো টাকা সাদা করারই নামান্তর, যার ফলে বড় ধরনের দুর্নীতি প্রশ্রয় লাভ করবে। কালো টাকার মালিকদের ক্রমাগত এ সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে প্রকারান্তরে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। তদুপরি, কালো টাকা সাদা করার সুযোগ আর্থিক অনিয়মের প্রসার ঘটায়।

- **কালো অর্থ এবং জাতীয় নিরাপত্তা:** কালো টাকা উপার্জনের সাথে মজুতদার, কালোবাজারি এবং চোরাকারবারি যুক্ত থাকায় এরা নিজেদের স্বার্থে বিভিন্ন সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে এবং অবাধ অর্থ উপার্জনের জন্য আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত থাকে। ফলে, কালো টাকা সাদা করার নিয়মিত সুযোগ প্রদানের ফলে "কালো টাকা রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে নষ্ট করে দিতে এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রম বিপজ্জনকভাবে ব্যাপকভাবে বিস্তার ঘটাতে পারে"[৪৫]।

---

[৪২] প্যারা ৪.৫, পৃ.১৯৪-১৯৫

[৪৩] রাজস্ব সংস্কার কমিশন রিপোর্ট ২০০৩, পৃ.১৮৫

[৪৪] প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৬

[৪৫] প্রাগুক্ত, পৃ.১৯১

বিগত বিভিন্ন সরকার কালো টাকাকে উৎপাদনশীল খাতে আনার জন্য বিভিন্ন ধরনের মার্জনা এবং কর প্রণোদনা দিতে বাজেটে বিভিন্ন প্রস্তাব দিলেও বাস্তবে ফলাফল যে খুবই কম তা রাজস্ব সংস্কার কমিশনের রিপোর্টে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে[৪৬]। এ অবস্থায় বর্তমান করদাতা এবং দেশের সাধারণ নাগরিকদের স্বার্থে যৌক্তিক কারণে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ প্রদান বন্ধের মাধ্যমেই কেবল সুশাসন এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব।

### ২.২.৪ সংস্কার কার্যক্রম

কর ফাঁকি রোধে ও সার্বিকভাবে কর ব্যবস্থার উন্নয়নে এনবিআর ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশি অর্থ-নির্ভর প্রকল্পের মাধ্যমে এনবিআর দক্ষতা উন্নয়নে পদক্ষেপ নিলেও এগুলো কতটুকু কার্যকর তা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। কর প্রশাসনের সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সরকারের আমলে অর্থ মন্ত্রণালয় বা এনবিআরের সক্ষমতা বৃদ্ধির নামে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে বিদেশি অর্থ নির্ভর প্রকল্প হাতে নেয়া হলেও এগুলোর বাস্তব ফলাফল সম্বন্ধে বরাবরই বিতর্ক রয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০০৭ সালের পূর্বে চট্টগ্রাম বন্দর অটোমেশনে প্রায় ২৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হলেও এ অটোমেশন হতে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারকারী ৪৫টি স্টেকহোল্ডার তেমন কোন সুবিধা গ্রহণ করতে পারে নি। ২০০৭ সালের পূর্বে প্রায় ২৪.৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল চট্টগ্রাম শুল্ক হাউজ অটোমেশনের জন্য, কিন্তু এ অটোমেশন হতে বন্দর ব্যবহারকারী ৪৫টি স্টেকহোল্ডার তেমন কোন সুবিধা গ্রহণ করতে পারে নি। ফান্ডের প্রধান অংশই ব্যয় হয়েছে বিদেশে প্রশিক্ষণ এবং বিদেশি ইক্যুইপম্যান্ট ক্রয়ের ক্ষেত্রে। পরবর্তী পর্যায়ে ২০০৭ সালে দেশীয় সফটওয়ারের মাধ্যমে বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজে অটোমেশন হয়। এর ফলে, দ্রুত শুল্কায়ন, ক্ষেত্রবিশেষে হয়রানি কমা, বিভিন্ন ইনডেমনটি বন্ডের বিপরীতে কাগজপত্র সংরক্ষণ এবং তার মাধ্যমে দ্রুত রিট পিটিশন মামলার নিষ্পত্তির মাধ্যমে বকেয়া রাজস্ব উদ্ধারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতা[৪৭] আসলেও বিভিন্ন প্রতিকূলতার দরুন এ সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি এবং দুর্নীতি এখনো বিদ্যমান। উল্লেখ্য এনবিআর প্রকাশিত ফিসক্যাল ফ্রন্টিয়ারের[৪৮] মতে, "Tax reform in Bangladesh appears to be mainly the product of bureaucrats' policy who seek to protect their position by minimizing the political cost of tax program while preventing a budget shortfall"।

কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিদেশি পরামর্শ-নির্ভর এলটিইউ (মূসক এবং আয়কর উভয় ইউনিট) এর নিম্ন পারফরমেন্স অনেক ক্ষেত্রেই অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। এনবিআর Asycuda ++ এর পরিবর্তে ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে Asycuda World[৪৯] চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এছাড়াও অটোমেশনের জন্য এনবিআর ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমান গবেষণায় বিদেশি অর্থ-নির্ভর সংস্কার প্রকল্পগুলো সম্বন্ধে যে তথ্যসমূহ বেরিয়ে এসেছে তা নিম্নরূপঃ

- সম্ভাব্য এবং ভবিষ্যৎ সংস্কার কার্যক্রম সম্পর্কে সরকারের নীতি-নির্ধারকদের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট কোনো দিক নির্দেশনা না থাকা।
- বিদেশি কনসালটেন্টের বিভিন্ন দেশের কর প্রশাসনের জন্য একই রকম সংস্কার কাঠামো অনুসরণের পরামর্শ প্রদান অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকর; যেমন, আইএমএফ এর পরামর্শে Large Taxpayer Unit (LTU) চালু হলেও রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে এর কাঙ্খিত অবদান উল্লেখযোগ্য নয়।
- কোন কোন ক্ষেত্রে এনবিআরের চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রকল্পসমূহে উচ্চ বেতনে বিদেশি পরামর্শকদের নিয়োগ দেয়া হয়। কাঙ্খিত পদে স্থানীয় তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ বা কনসালটেন্ট ফার্ম সহজলভ্য হওয়া সত্ত্বেও নিয়োগ দেয়া হয় নি, উল্টো ক্ষেত্রবিশেষে, উচ্চ বেতনে কাংখিত মানের যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তথাকথিত বিদেশি বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দেয়া হয়।
- বিদেশি অর্থ-নির্ভর সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহের প্রভাব/ফলাফল/আউটপুট এবং এনবিআর কর্তৃক তা গ্রহণের মাত্রা বিবেচনা না করে Customs Automation and Modernization Project (CAMP), Modernization and Automation Project (MAP) এর ন্যায় নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও ইতোমধ্যে সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহের ফলাফল এবং তা বাস্তবায়নের মাত্রা সন্তোষজনক নয়।

---

৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ.১৯১

৪৭ পরিশিষ্ট ৫

৪৮ ৭ম ইস্যু, বিসিএস (শুল্ক এবং মূসক) এসোসিয়েশন জার্নাল, ২৬ জানুয়ারী, ২০১০

৪৯ এটা বৈশ্বিক মানের এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় অনেক কার্যকরী হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে শুল্কায়নের সার্বিক কাজ অফিসে বসেই করতে পারবে।

• এনবিআরের স্টাফদের সক্ষমতা বৃদ্ধি না করেই এসব সাহায্য/ঋণনির্ভর প্রকল্প গ্রহণ ও সমাপ্ত করায় প্রকল্প সমাপ্তের পর প্রকল্পের ফলাফলও হারিয়ে যায়।

• বিদেশ ভ্রমণ ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধার কারণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা বিদেশি অর্থ-নির্ভর এসব প্রকল্পে আগ্রহ দেখান বলে অভিযোগ রয়েছে।

• মূসক এবং অন্যান্য বিভাগে অটোমেশনের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রশাসনের দুর্নীতিপরায়ণ কর্মীর একাংশের অসহযোগিতা অন্যতম।

উল্লেখ্য, ২০১০ সালের এপ্রিলে এফজিডি করার সময় বন্দর ব্যবহারকারী ব্যবসায়ীবৃন্দ বলেছে যে, অটোমেশন বা অনলাইন পদ্ধতি কাজ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না শুল্ক কর্মকর্তারা নির্দিষ্ট সময়ে হয়রানি বা ঝামেলামুক্তভাবে শুল্কায়নের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। অনেক ক্ষেত্রেই আমদানিকারকরা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে অভিজ্ঞ নয়। তাছাড়াও, শুল্ক বিভাগে সঠিক এবং আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পরিশীলিত ডাটাবেজ এবং তা আদান-প্রদানের বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ। অটোমেশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এজেন্ট কর অ্যাসেসমেন্টের জন্য তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারবে এবং সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট, শুল্ক কর্মকর্তা এবং রপ্তানিকৃত দেশে যোগাযোগ করতে সক্ষম হবে।

### ২.২.৫ পরোক্ষ করের ওপর নির্ভরতা ও কর ভার

এনবিআর এর সার্বিক রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও প্রত্যক্ষ করের অবদান বাড়েনি। ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত সার্বিক রাজস্ব সংগ্রহে পরোক্ষ করের অবদান ছিল ৭২% (চিত্র ৪), যেখানে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী দেশগুলোতে প্রত্যক্ষ করের অবদানই বেশি। ২০০৯-১০ অর্থবছরে এর অবদান কিছুটা হ্রাস পেলেও মূসকের অবদান সর্বোচ্চ। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে পরোক্ষ বিক্রয় বা পণ্য ও সেবা করের হার ভারত (২-১২.৫%), মালয়েশিয়া (০%), সিঙ্গাপুর (৭%), কানাডার (৫%) চেয়েও বেশি। এসব দেশে প্রত্যক্ষ বা আয়করের হার বাংলাদেশের চেয়েও বেশি। উল্লেখ্য যে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নির্দেশ অনুযায়ী এবং অপরিকল্পিতভাবে কিছু পণ্যের শুল্ক কমানোর ফলে সার্বিক রাজস্ব সংগ্রহে শুল্কের অবদান ক্রমান্বয়ে কমছে। পরোক্ষ করের পরিমাণ বেশি হওয়ার ফলে এর প্রভাব নিম্ন আয়ের নাগরিকদের ওপর বেশি পড়ে।

**চিত্র ৪: বিভিন্ন ধরনের করের অবদানের তুলনামূলক চিত্র**

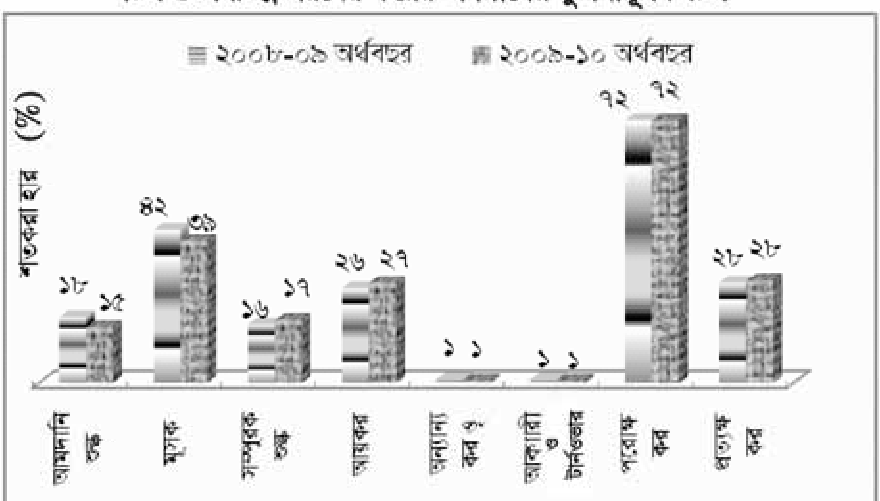


সূত্র: এনবিআর, জুন ২০১০

### ২.২.৬ কর-ভার

বিশ্বব্যাপি প্রাক্কলনকৃত করের বোঝা হিসাব করলে, ২০০৯ সালে বাংলাদেশের কর-ভার যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, এবং থাইল্যান্ডের নাগরিকদের তুলনায় অধিক[৫০]। অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী বিভিন্ন দেশে কর-ভার বেশি হলেও নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দের পরিমাণও বেশি।

---

৫০ www.forbes.com/global/2009/0413/034-tax-misery-refomr-index.html

উন্নত বিশ্বের এবং পশ্চিমা কল্যাণমুখী রাষ্ট্রসমূহে (যেমন, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, সুইডেন, কানাডা, প্রভৃতি দেশে) যেখানে ব্যক্তি পর্যায়ের করদাতা আয়ের ৫০% হতে ৬০% হারে কর প্রদান করে থাকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশগুলোতে ব্যক্তি পর্যায়ে করদাতাদের উপর উচ্চ কর হার ধনী-দরিদ্রের আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধি রোধ করার অন্যতম উপায় হিসাবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশেও উচ্চ আয় সম্পন্ন নাগরিকগণের ওপর সর্বোচ্চ কর হার ২৫% রাখার বাস্তব সম্মত কোন যুক্তি নাই, প্রগতিশীল হারে করারোপ করা উচিৎ। বাংলাদেশের খুব বেশি আয় সম্পন্ন করদাতাদের জন্য কর হার বাড়ানো হলে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদা পূরণে প্রকল্প গ্রহণের ফলে তারা উপকৃত হবে। তাছাড়াও, উন্নত দেশগুলোর ন্যায় উপার্জনকালীন সময়ে উচ্চ কর হার প্রযোগ করে অক্ষম/বৃদ্ধ বয়সে আয় নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব।

**চিত্র ৫: বিশ্বব্যাপী কর -ভারের হার**

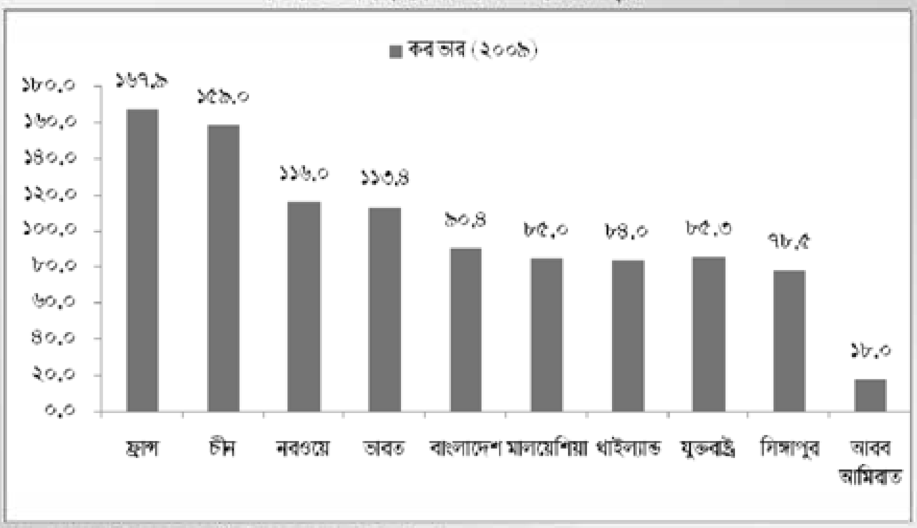


সূত্র: http://images.forbes.com, ২০০৯।

## ২.২.৭ অহরহ বিভিন্ন অধ্যাদেশ (এসআরও) জারি ও আইনের পরিবর্তন

এনবিআর প্রায়ই অর্থ বিলের পরীক্ষামূলক পরিবর্তন করে থাকে। Statuatory Regulatory Order (SRO) জারির মাধ্যমে আইনের অহরহ পরির্বতন হয়ে থাকে, যার সাথে বিভিন্ন নীতিনির্ধারকবৃন্দ ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত আয়কর আইন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এরূপ করা হয়ে থাকে। ২০০৮ সালের অর্থ বিলের মাধ্যমে ২৭টি সেকশন এবং ৬ষ্ঠ তফশীলে পরিবর্তন আনা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবিক কোন প্রয়োজন ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বিশেষকে সুবিধা প্রদানের জন্য আইন পরিবর্তন এবং কয়েক বছর পর আবার একই আইনের পরিবর্তন করা হয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সেকশন ৩৮ক, ৩৮কক এর এখন অস্তিত্ব নেই, যার মাধ্যমে নতুন করদাতার (এসেসিসমূহ) পছন্দমত প্রাথমিক মূলধন নিয়ে ব্যবসা করার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এরকম আরো কিছু উদাহরণ নিম্নে বর্ণিত হল:-

ক) 'অর্থ বিল ২০০৩' এ ২০০৮ সালে 'সেলফ অ্যাসেসম্যান্ট পদ্ধতি'র আওতায় নতুন সেকশন ৯৩(৫) সংযুক্ত করা হলেও পরে তা বাতিল করার ফলে এ পদ্ধতির আওতায় ভবিষ্যতে নতুন করে ফাইল খোলার সুযোগ বন্ধ হয়ে গেছে।

খ) পূর্বে, কর আপিলাত ট্রাইবুনালে মামলা নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে জোনাল কমিশনারদের দায়িত্বে থাকায় তা অপব্যবহারের অভিযোগে বাতিল হলেও ২০০৮ সনে কমিশনারদের পুনরায় সে দায়িত্ব কেন দেওয়া হলো তার কোনো ব্যাখ্যা জানা যায়নি। এর ফলে অবৈধ অর্থ উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলে মুখ্য তথ্যদাতারা উল্লেখ করেছেন।

আয়করের বিভিন্ন ধারা এবং বিধির অপরিকল্পিত পরিবর্তন আইনকে অনেক দুর্বল এবং সাংঘর্ষিক করে তুলেছে। এ ধরনের পরিবর্তনের ফলে এনবিআর, আইনজীবি এবং করদাতাদের কার্যক্রমে সামঞ্জস্য বিধান করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ধরনের অধ্যাদেশ জারির বাস্তব প্রভাব, বিশেষ করে শুল্ক হারের পরিবর্তন, কখনো চিহ্নিত/নির্ণয় করা হয়নি।

### ২.২.৮ এনবিআর চেয়ারম্যান পদে অনবরত পরিবর্তন এবং নেতৃত্ব শূণ্যতা

১৯৭২ সালের ৭৬ অধ্যাদেশ অনুযায়ী এনবিআর এর সদস্যদের মধ্য থেকে এর চেয়ারম্যান নিযুক্তির বিধান থাকলেও তা না মেনে বাইরে থেকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হতো। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে এটি বৈধ করা হয়। তবে দেখা যায় এনবিআর এর চেয়ারম্যান পদে অনবরত পরিবর্তন করা হয়। ১৯৭২ থেকে শুরু করে গত ৩৮ বছরে ২৬ জনকে চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করা হয়, এমনকি ১৪ দিনের জন্যও চেয়ারম্যান নিয়োগ (০৯-০১-২০০৭ হতে ২৩-০১-২০০৭ পর্যন্ত) দেওয়া হয়। এ পদে পরিবর্তনের জন্য বাইরের হস্তক্ষেপের অভিযোগ রয়েছে। একজন প্রাক্তন চেয়ারম্যানের মতে আইএমএফ এর পরামর্শে অর্থ মন্ত্রণালয়ে কর নীতি ইউনিট স্থাপনের বিরোধিতা করায় তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসরে যেতে হয়। তাছাড়া বিশ্বব্যাংকের অর্থে 'রাজস্ব ভবন' তৈরির বিরোধিতা করায় তাঁকে বদলিও করা হয়।[৫১] উল্লেখ্য এনবিআর এর চেয়ারম্যান বাইরে থেকে নিয়োগ করায় প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর আয়কর, শুল্ক এবং মূসক আইনের উপর জ্ঞানের ঘাটতি থাকে। ফলে নেতৃত্বের শূন্যতা সৃষ্টি হয় এবং কিছু সংখ্যক স্টাফের হাতে সব ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। বোর্ডের কোনো কোনো সদস্য এ সুযোগ নিয়ে অনৈতিক সুবিধা নিয়ে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। তাছাড়া কিছু কিছু বোর্ড সদস্যের দক্ষতার ঘাটতির ফলে দৈনন্দিন বিভিন্ন সিদ্ধান্তের জন্য চেয়ারম্যানের ওপর নির্ভর করতে হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

### ২.২.৯ কর প্রণোদনা সুবিধার অপব্যবহার

এনবিআর ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে জিডিপি'র ২.৫২% কর প্রণোদনা বা কর-অবকাশ সুবিধা বাবদ রাজস্ব হারিয়েছে (এনবিআর, মার্চ ২, ২০১১)। রাজস্ব সংস্কার কমিশন রিপোর্ট (২০০৩) মতে, "Exemptions and tax holidays have created a distorted production structure leading to large revenue losses"।[৫২] বাংলাদেশ সরকার কয়েকটি খাতে যেমন, উচ্চ মূল্যের গার্মেন্ট সামগ্রী, ঔষধ সামগ্রী, পাট ও প্লাষ্টিকজাত পণ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত কর অবকাশ সুবিধা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিলেও কোন নির্দিষ্ট কোম্পানি কর্তৃক কর অবকাশ সুবিধা গ্রহণের মেয়াদ কমিয়ে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে কর অবকাশ সুবিধার প্রকৃত প্রভাব নির্ণয়ে এখন পর্যন্ত কোন বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা হয়নি। কর অবকাশ সুবিধার অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণের মাধ্যমেই এ ধরনের সুবিধা প্রদানের ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা দেয়া উচিত। কিন্তু, বিভিন্ন সময়ে কর প্রণোদনা বা কর অবকাশ সুবিধার প্রভাব যাচাই না করেই আইনের পরিবর্তন, যেমন এসআরও জারি করে ২০১১ সনের ৩১শে জুন পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির ফলে কর ফাঁকির সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। কর অবকাশ সুবিধার অপব্যবহার সম্বন্ধে বক্স ৩ এ ২টি কেস স্টাডি উল্লেখ করা হল।

**বক্স ৩ঃ কর্পোরেট সেক্টর কর্তৃক কর অবকাশ সুবিধার অপব্যবহার**

**কেস ১ঃ** একটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানী 'ক' ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ৫০ মিলিয়ন টাকা লাভ করে, কিন্তু কর ফাঁকির জন্য নামমাত্র ১ লাখ টাকা লাভ দেখায় এবং বাকি ৪.৯৯ মিলিয়ন টাকা একই গ্রুপের কর-অবকাশ সুবিধা প্রাপ্ত মুরগির খামারে উন্নয়ন ব্যয় হিসেবে দেখানো হয়। কিন্তু বাস্তবে এ টাকা প্রকৃতপক্ষে প্লট উন্নয়ন বাবদ ব্যয় হয়। উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট মুরগির খামারের দৈনিক ডিম উৎপাদন ক্ষমতা ৪,০০০ এবং তার মূলধন ও উৎপাদন খরচ হিসাব করলে প্রতি ডিমের উৎপাদন খরচ দাড়ায় ৩০০০ টাকায়। (সূত্রঃ মূখ্য উত্তরদাতা)

**কেস ২ঃ** একজন ব্যবসায়ীর মতে, তিনি ১৯৭২ সনে মায়ের নিকট হতে ৩,০০০ টাকা নিয়ে ট্রেডিং ব্যবসা শুরু করে এবং অল্প সময়ের মধ্যে সে বেশ লাভ করে। অনুসন্ধান রিপোর্টে দেখা যায়, সে ৩০ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগে নতুন ফার্মটি প্রতিষ্ঠা দেখিয়েছে, যাতে মূলধন হিসেবে মাত্র ৩ লাখ টাকা দেখায়। তাছাড়া, শিল্পের বিপরীতে ব্যাংক ঋণ নিলেও তা কখনো পরিশোধ করেনি, একাধিকবার ঋণ পুণঃতফসিল করা হয়। ঐ ফার্ম পূর্বের ট্রেডিং ব্যবসার চেয়ে ৪/৫ গুণ লাভ করলেও অডিটরের সহায়তায় কর ফাঁকি দেয়। কর অবকাশ কাল শেষ হওয়ার পর একই কোম্পানি লোকসান দেখাতে শুরু করে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, আসলে কর হ্রাস সুবিধা পাওয়ার জন্য উপার্জিত লাভ অন্য নতুন ব্যবসায় বিনিয়োগ করে ও ফার্মের প্রাচীর ব্যতীত ফার্মের অভ্যন্তরে কিছুই খুঁজে পাওয়া যায়নি। (সূত্রঃ দুদকের অনুসন্ধান রিপোর্ট, ২০০৮)

---

[৫১] http://www.bangladesh-web.com/view.php?hidRecord=174613

[৫২] প্রাগুক্ত

উল্লেখ্য যে, গবেষণায় একাধিক কর্পোরেট গ্রুপ বা কোম্পানিসমূহের মূলধন বা উন্নয়ন ব্যয়, অতিরিক্ত পরিচালনা ব্যয়, আন্ডার/ওভার ইনভয়েসের মাধ্যমে মূলধন যন্ত্রপাতির উচ্চ মূল্য দেখিয়ে কোম্পানীর লাভ গোপন করার ঘটনা চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়াও, একই করদাতাদের অন্য খাতে করযোগ্য অথচ কর প্রদান করা হয় নাই এমন কর অনারোপিত আয়কে (Untaxed Money) বৈধ/জায়েজ করার জন্য প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় মৎস্য চাষ, পোলট্রি ফার্ম খাতে করদাতাদের বাস্তবে যে পরিমাণ আয় আহরিত হয় আয়কর রিটার্ণে উক্ত খাত সমুহ হইতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে আয় প্রদর্শন করা হয়। এ সকল ক্ষেত্রে করদাতাগণ কর্তৃক প্রদর্শিত অধিক আয় কর নির্ধারনী কর্মকর্তাদের বাস্তবে মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। এমনকি এ সকল খাতে আহরিত আয়ের জন্য করদাতাগণ বাস্তব অপেক্ষা অনেক বেশি আয় প্রদর্শন করার জন্য যে কৃত্রিম হিসাব বিবরণী দাখিল করে কর নির্ধারণী কর্মকর্তাগণ তা মেনে নিতে বাধ্য হন। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, বিভিন্ন দুর্নীতির সাথে যুক্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ তাদের স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজনদের নামে আয়কর নথি খুলে বানোয়াট মৎস্য/অন্যান্য খামার দেখিয়ে সেখানে বিরাট অংকের করমুক্ত আয় রিটার্নে প্রদর্শন করে তাদের অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদকে বৈধ করার হাতিয়ার হিসাবে এ পদ্ধতিকে ব্যবহার করছে। উল্লেখ্য যে, এ গবেষণায় কর ফাঁকিতে সার্বিকভাবে বিভিন্ন সিএ ফার্মের সহায়তার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

যদিও, কর অবকাশ সুবিধার অপব্যবহার রোধে এনবিআর ইতোমধ্যে কর অবকাশ সুবিধার মেয়াদ কমিয়ে দিয়েছে, তবে কর প্রণোদনা সুবিধার অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণের মাধ্যমেই এ ধরনের সুবিধা প্রদানের ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা দেয়া উচিত। তাছাড়াও, বিভিন্ন সময়ে দিক নির্দেশনাহীন বা অপরিকল্পিত আইনের পরিবর্তন কর ফাঁকির সুযোগ সৃষ্টি করছে।

### ২.২.১০ রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং অর্জন

যদিও ২০০৯-১০ অর্থবছর রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল, তথাপি এনবিআর প্রায় সময়ই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয় না। এর মূল কারণসমূহ হলো, ১) কর আত্মসাৎ বা কর ফাঁকি; ২) সম্ভাব্য করের পরিমাণ সম্পর্কে এনবিআরের তথ্য স্বল্পতা; ৩) বিভিন্ন কর খাত বা স্থানীয় কর অফিসের গ্রুপ-ভিত্তিক পারফরমেন্সের সঠিক তথ্য এনবিআরে না থাকায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া; ৪) অভিযোগ আছে, এনবিআর রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা প্রকৃত সক্ষমতার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ে এমনভাবে নির্ধারণ করে যেন একই পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি অর্জন দেখাতে পারে।

### ২.২.১১ বকেয়া কর পরিশোধে পদক্ষেপের অকার্যকরতা

চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজে অটোমেশনের সাহায্যে ফাইলগুলো পর্যালোচনা এবং এনবিআরের সব মিলিয়ে প্রায় ১২০,০০০ কোটি টাকা শুল্ক রাজস্ব বকেয়া হিসেবে বছরের পর বছর পড়ে ছিল। সার্বিক মনিটরিং করে প্রায় ১২ বিলিয়ন টাকা বকেয়া রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হয়েছে। এ অবস্থায় এনবিআর বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও তার বাস্তবভিত্তিক ফলাফল পেতে সময় লাগবে বলেই মনে করে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ।

উপরোক্ত সমস্যাসমূহ ছাড়াও, নীতিগত পর্যায়ে বিভিন্ন সমস্যাসমূহ হল নীতি প্রণয়ন এবং বাজেট তৈরির ক্ষেত্রে এনবিআর এর সুপারিশসমূহ অমান্য করা, গবেষণাভিত্তিক কোনো তথ্য ব্যতীত রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, এনবিআরে অটোমেশনের ক্ষেত্রে কম নজর দেয়া এবং প্রতিশ্রুতির ঘাটতি, এবং 'সরকারি অর্থায়ন নীতি' সম্বন্ধে নীতি নির্ধারকদের জ্ঞানের স্বল্পতা।

### ২.২.১২ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে পদক্ষেপ

নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অন্যান্য চ্যালেঞ্জের মধ্যে গবেষণাভিত্তিক তথ্য ছাড়া রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, করের হার ও রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে হস্তক্ষেপ, ট্যারিফ কমিশনকে অকার্যকর করে রাখা, বকেয়া কর পরিশোধে পদক্ষেপের অকার্যকরতা, বাংলাদেশি নাগরিকদের উপর উচ্চ কর-ভার পর্যালোচনা না করা, কর সংক্রান্ত নীতি এবং বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে এনবিআর এর সুপারিশ অবজ্ঞা করা, ট্যারিফ কমিশনকে অকার্যকর করে রাখা, এবং সর্বোপরি কয়েকটি ক্ষেত্রে অনিয়মের সাথে সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের কোনো কোনো ব্যক্তির জড়িত থাকা উল্লেখযোগ্য (সারণি ২)।

### সারণি ২: ক্ষমতার অপব্যবহার করে কর সংক্রান্ত অনিয়ম

| বিষয় | চ্যালেঞ্জ |
|---|---|
| গাড়ি আমদানি | করমুক্ত গাড়ি নিজে ব্যবহার না করে অভ্যন্তরীণ বাজার মূল্যে বিক্রির সুযোগ |
| কর হার নির্ধারণ | অর্থের বিনিময়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে কর হার কমানো বা বাড়ানো |
| কর ফাঁকি | প্রকৃত আয়ের চেয়ে স্বল্প আয় প্রদর্শন |
| অনুমোদন/আইনের পরিবর্তন | বাজেটে শুল্ক হার ও প্রণোদনা প্রদানে প্রভাব বিস্তার |
| পদোন্নতি, পদায়ন | কর কর্মকর্তাদের কাছ থেকে অবৈধ আর্থিক সুবিধা গ্রহণ |
| আয়কর ফাইল প্রক্রিয়াকরণ | ব্যক্তিগত কর অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার |
| | কর ফাঁকি এবং কর প্রদানে নিজ ক্ষমতা বা পদকে ব্যবহার |
| লাইসেন্স ইস্যুকরণ | বন্ড, সিএন্ডএফ/পিএসআই এজেন্টের লাইসেন্স ইস্যুতে প্রভাবিত করা |
| শুল্কায়ন প্রক্রিয়া | অন্যায় সুবিধা প্রদানের জন্য কর কর্মকর্তার ওপর চাপ প্রয়োগ করা |

## তৃতীয় অধ্যায়
# জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নীতিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে চ্যালেঞ্জসমূহ

রাজস্ব ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হলো, ৪টি 'R' অর্থাৎ ক. 'রাজস্ব' (Revenue)- সরকারি ব্যয় সংস্থানের জন্য; খ. পুন:বিতরণ (Redistribution)- সমাজের ধনী ব্যক্তিদের সম্পদ গরিব ব্যক্তিদের মধ্যে হস্তান্তর; গ. পুন:দাম নির্ধারণ (Re-pricing)- পণ্যের বাহ্যিকতা পরিমাপ; ঘ. প্রতিনিধিত্ব (Representation)- আইন প্রণয়নকারীর কর প্রদানের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।[৫৩] রাজস্ব প্রশাসন মূলত সরকারের উন্নয়ন এবং রাজস্ব ব্যয় সংকুলানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। উপরোক্ত নীতিগুলোকে বিশেষ বৈশিষ্টসমূহে ব্যাখ্যা করা হয়, যেমন ১. সামাজিক এবং বন্টনে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা; ২. জ্ঞানভিত্তিক; ৩. অংশগ্রহণমূলক; ৪. ব্যবসা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বান্ধব; ৫. ব্যবসার ব্যয় হ্রাস এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ; এবং ৬. করের পরিমাণ নয় বরং করের আওতা বৃদ্ধি করে ও কর ফাঁকি/আত্মসাতকারীদের পাকড়াও করার মাধ্যমে রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে। প্রত্যক্ষ কর (যেমন আয়কর) জবাবদিহিতা এবং সুশাসন ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি করে; অন্যদিকে পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা এবং হয়রানির সুযোগ বেশি[৫৪]। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক এবং পরিচালনাগত চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হয়েছে।

### ৩.১ আইনি সীমাবদ্ধতাসমূহ

২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে,"কর আহরণে আরেকটি অসুবিধা হচ্ছে বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করে প্রায়ই কর আদায়। আয়কর, আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, ভূমিকর এবং আরও অন্যান্য সূত্রে সরকারি রাজস্ব আদায়ে অনেকেই আইনের আশ্রয় নিয়ে অসুবিধা সৃষ্টি করেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা আদায় বিভিন্ন মামলা-মোকাদ্দমায় স্থগিত হয়ে আছে"[৫৫]। এনবিআর ইতোমধ্যে মূসক, শুল্ক এবং আয়কর অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৪, এর খসড়া সংস্করণ মতামত গ্রহণের জন্য এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে। তবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে উল্লেখজনক পরিবর্তন ঘটলেও কর স্টাফদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং করদাতা হয়রানি রোধে কোন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান বর্তমান খসড়া সংশোধিত আইনসমূহে নিশ্চিত করা হয়নি।

#### ৩.১.১ আয়কর আইন/অর্ডিন্যান্স এবং বিধানসমূহ

যদিও বিভিন্ন আয়কর আইন প্রণীত হয় করদাতাদের সুবিধার জন্য, কিন্তু জরিপকৃত করদাতাদের ৭৩.৮% (যার মধ্যে ৭৫.৫% কোম্পানি করাদাতা) বিদ্যমান আয়কর আইন মেনে কর দেওয়া জটিল বলে উল্লেখ করে। অধিকাংশ করদাতা আয়কর আইনের জটিলতা এবং কর স্টাফদের একাংশ কর্তৃক ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য আইনের অপপ্রয়োগের কথা জানান। আয়কর অর্ডিন্যান্সের প্রায় বিভিন্ন ধারার[৫৬] (যেমন ধারা ১৯, ৮২, ৮৩) অপব্যবহারের মাধ্যমে করদাতাদের হয়রানি ও দুর্নীতির ক্ষেত্র তৈরি হয়।

#### ৩.১.২ শুল্ক আইন ও বিধিসমূহ

১৩৫ জন সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টদের ওপর পরিচালিত জরিপে উত্তরদাতার মধ্যে ৩৪ শতাংশ শুল্ক আইনকে জটিল বলে উল্লেখ করেছেন (পরিশিষ্ট ৪)। এনবিআর কর্তৃক আইনের বিভিন্ন পরিবর্তন আনা সত্ত্বেও আইন প্রয়োগে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতাসমূহ হল:-

- শুল্ক ফাঁকি, পণ্যের প্রকৃতি, মূল্য ও পরিমাণ সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রদান বন্ধে কোনো ধারা সংযোজন বা পরিবর্তন আনা হয়নি।
- অনেক বেশি এসআরও, শিডিউল এবং বিধির ফলে শুল্কায়নের পুরো পদ্ধতি এখনো অনেক জটিল, শুল্ক ফাঁকি ও একচ্ছত্র ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ এখনো বিদ্যমান।

---

৫৩ http://en.wikipedia.org/wiki/Tax

৫৪ Cobham, Alex (2007-01), "The tax consensus has failed!" The Oxford Council on Good Governance. http://www.oxfordgovernance.org/fileadmin/Publications/ER008.pdf. Retrieved on 2007-09-30. Ross, Michael, L. (2007-01-27). "Does Taxation Lead to Representation?" UCLA Department of Political Science http://www.polisci.ucla.edu/faculty/ross/taxrep.pdf., 2007 সালের ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখে সংগৃহীত

৫৫ বাজেট বক্তব্য ২০১০-১১, ২৫১ নং অনুচ্ছেদ

৫৬ পরিশিষ্ট ৩

- শুল্কায়নের সকল ক্ষেত্রে ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অটোমেশন চালু এবং আমদানিকালে পণ্যের আন্তর্জাতিক মূল্য যাচাই, নির্দিষ্ট সময় এবং আইনি কাঠামোর মধ্যে শুল্কায়ন সম্পন্ন করার আইনগত বাধ্যতা এখনো নিশ্চিত করা হয়নি।
- আন্তর্জাতিক কাস্টমস ইউনিয়ন এর স্বাক্ষরদানকারী দেশ বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হিসেবে ভ্যালুয়েশন নীতিমালা এখনো হালনাগাদ করা হয়নি।

### ৩.১.৩ মূসক আইন

মূসক প্রদানকারী ব্যবসা ইউনিটদের উপর জরিপে উত্তরদাতাদের ৮৩% কর কর্মকর্তাদের আইন সম্পর্কিত জ্ঞানের স্বল্পতা ও দুর্বল বোধগম্যতা বা অক্ষমতার কথা উল্লেখ করে। এনবিআর ইতোমধ্যে মূসক আইনে কিছু পরিবর্তন এনেছে, যেমন আপিলাত ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট করার সুযোগ, এবং মূসক প্রদানকারীর ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা। আইনের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা কমাতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপঃ-

- বর্তমানে মূসক আইন এবং বিধানসমূহ ১৯৯১, এসআরও, এসওসমূহ এবং সাধারণ আদেশসমূহ মিলে প্রায় ২০০০ পৃষ্ঠা, কোন করদাতা বা কর কর্মকর্তার জন্য এ সকল আইনকে বোধগম্য করা এবং আইন প্রয়োগ অনেক জটিল ও সামঞ্জস্য বিধান করাও কঠিন।
- একই সেবা বা পণ্যের জন্য একাধিক এসআরও থাকায় (যেমন, একমাত্র বীমা সেবার জন্য ১১টি এসআরও এবং এসও বিদ্যমান) মূসক জারি করায় অস্বচ্ছতা সৃষ্টি হয়[৫৭] এবং তারা কর ফাঁকির সুযোগ গ্রহণ করছে।
- স্থানীয় উৎপাদিত পণ্য এবং একই পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে মূসকের হার সুষম নয়, আমদানির ক্ষেত্রে কম কর প্রদান করতে হয়।
- মূসক প্রদান এবং সরকারের কোষাগারে তা জমা করার ক্ষেত্রে ভোক্তার দায়িত্ব এখনো নির্ধারিত হয়নি।

## ৩.২ এনবিআরের প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জসমূহ

এনবিআরের প্রেরিত মতামত, মুখ্য তথ্যদাতা এবং বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যানগত তথ্য বিশ্লেষণ করে এনবিআরের প্রকৃত ক্ষমতা ও দক্ষতায় প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিম্নে আলোকপাত করা হল।

### ৩.২.১ সীমিত ক্ষমতা

অন্যান্য দেশের রাজস্ব সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বাস্তবে এনবিআরের ক্ষমতা অনেক সীমিত। অন্যান্য দেশে বিশেষকরে সিঙ্গাপুর অভ্যন্তরীণ রাজস্ব কর্তৃপক্ষ রাজস্ব সংগ্রহের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার ক্ষেত্রে যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত। কানাডিয়ান রেভেনিউ এজেন্সি সরকার এবং বিভিন্ন প্রদেশের জন্য কর আইন প্রণয়ন, বিভিন্ন প্রদেশ এবং সরকারি যে কোনো সংস্থার সাথে বৈসাদৃশ্য কর হার এবং সেবাসমূহের ব্যয়-পুনরুদ্ধার এর ভিত্তিতে নতুন পার্টনারশিপে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত।[৫৮] এছাড়াও, অভ্যন্তরীণ রাজস্ব ব্যুরো, যুক্তরাষ্ট্র এর নিজস্ব আইন এবং বিধান তৈরির ক্ষমতা রয়েছে।

অথচ এনবিআর এর চেয়ারম্যান বা প্রধান নির্বাহী নিয়োগ, কর ফাঁকি বা আত্মসাৎ প্রতিরোধে সংস্থার নিজস্ব বিধান এবং বিধি তৈরির কোনো ক্ষমতা নেই। এনবিআরের ক্ষমতা প্রয়োগে প্রয়োজনীয় সম্পদের ঘাটতিও অন্যতম চ্যালেঞ্জ। একাধিক প্রাক্তন চেয়ারম্যান অভিযোগ করেছেন যে, এনবিআর কখনো এর রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা, বাজেট তৈরিতে বিভিন্ন কর হার বা অন্যান্য শর্তসমূহ স্বাধীনভাবে নির্ধারণ করতে পারে না।

### ৩.২.২ বাজেট তৈরিতে এনবিআরের ভূমিকা

সরকার ইতোমধ্যে 'সরকারি অর্থায়ন এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯' পাসের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট সংক্রান্ত দায়িত্ব সুস্পষ্ট করেছে। যদিও এনবিআর গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে বাজেট বিষয়ে পরামর্শ শুরু করেছে, তবে বাজেটের বিভিন্ন বিধি প্রদানে বিভিন্ন ধরনের স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর অবৈধ প্রভাব বিশেষ করে কালো টাকা সাদা করার ব্যাপারে বিস্তারের অভিযোগ করেছেন একাধিক কর্মকর্তা। এনবিআর বাজেট বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান না দিলেও এর অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের পরিমাণ নিশ্চিত করতে পারে না।

---

[৫৭] প্রাগুক্ত

[৫৮] ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে the Management Board of the Canadian Revenue Agency (CRA) clearly defines the Board's statutory responsibilities; it administers tax laws; various social, economic benefit and incentive programs delivered through the tax system. CRA is committed to work closely with stakeholders, providing excellent service to clients, and ensuring responsible enforcement of legislation.

### ৩.২.৩ প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং অবকাঠামোগত সুবিধার স্বল্পতা

বিশেষ ক্ষেত্রে এনবিআর এর নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সর্বনিম্ন বরাদ্দ নিশ্চিত করতে পারে না। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে প্রতি ১০০ টাকা প্রত্যক্ষ ও অন্যান্য কর সংগ্রহে গড়ে ১ টাকা এবং পরোক্ষ কর সংগ্রহে গড়ে ০.৬ টাকা ব্যয় হয়। স্থানীয় পর্যায়ে কর অঞ্চল বা জোনাল অফিসের কার্যক্রম অনেক ক্ষেত্রেই ভাড়া বাড়িতে পরিচালনা করতে হয় এবং দৈনন্দিন কার্যক্রম চালাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ঘাটতি রয়েছে। অন্যদিকে এনবিআর এর অবকাঠামোগত সুবিধার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত অপ্রতুলতা এখনো বিদ্যমান:

- অনলাইন বা অটোমেটেড কর প্রদান পদ্ধতি পুরোপুরি চালু না হওয়া;
- বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামোগত সুবিধার (যেমন, কম্পিউটার, অফিস পরিসর, যানবাহন ইত্যাদি) ঘাটতি;
- বিভিন্ন বিভাগের (আয়কর, মূসক এবং শুল্ক) মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় জনবল এবং উপকরণের ঘাটতি।
- কর্মীদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থের ঘাটতি।

**বক্স ৪: জেলা পর্যায়ের কর অফিসে অপর্যাপ্ত কর স্টাফ এবং অফিস পরিচালনার উপকরণের স্বল্পতা**

১টি কোম্পানি সার্কেলসহ ৯টি সার্কেলের সমম্বয়ে গঠিত উপ-কর কমিশনারের আওতায় পরিচালিত কর জোন 'ক' এর মাত্র ৯ জন কর স্টাফের সমম্বয়ে প্রায় ১,১০,০০০ কর ফাইল তত্ত্বাবধান করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, এনবিআর এ ২০০৭ এর পর কর এসেসমেন্টকারীর সংখ্যা বাড়লেও কর স্টাফদের সংখ্যা গত ৩৯ বছরে প্রায় একই রয়েছে। এ জোনের উপ-কর কমিশনারকে বছরে প্রায় ১২ হাজার ফাইল তত্ত্বধান করতে হয় এবং রিটার্ণ জমা দেয়ার সময় ৪-৫ জন স্টাফকে গড়ে প্রতি কার্যদিবসে প্রতি ঘন্টা ২০টি ফাইল পরীক্ষা করতে হয়। উল্লেখ্য, অতিরিক্ত কাজের চাপ ঘুষের লেনদেন বা করদাতা হয়রানির সুযোগ তৈরি হয়। এ ধরনের প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও কর জোন 'ঋ' কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায় ৩০ শতাংশ বেশি কর আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশে এ ধরনের জোনাল অফিসের নিজস্ব কোনো অফিস স্পেস নেই, ভাড়া বাড়িতে অফিস করতে হয়। তাছাড়াও, অবকাঠামোর সুবিধা তেমন না থাকায় সার্কেল অফিসগুলোর সাথে সমম্বয়ের ক্ষেত্রে কর বিভাগের স্টাফবৃন্দ প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। এ ধরনের অবকাঠামো সমস্যা এনবিআর এর আওতায় বাংলাদেশের সকল স্থানীয় কর সার্কেল এবং জোনাল অফিসগুলোতে বিরাজমান। সরকারের আর্থিক সক্ষমতা সৃষ্টি বা উন্নয়ন কাজের অর্থ বরাদ্দে এনবিআর অবদান রাখলেও এসব অফিসের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ নিতান্তই অল্প। অনেকটা 'প্রদীপের নিচেই অন্ধকার' এর ন্যায়। (সূত্র: সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল পর্যবেক্ষণ, ২০১০)

### ৩.২.৪ এনবিআরের বিভিন্ন বিভাগের সমম্বয়হীনতা

এনবিআর প্রকৃতপক্ষে আয়কর, শুল্ক, মূসক বিভাগের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করে। যদিও প্রত্যেক বিভাগ এবং বিভিন্ন আন্তঃবিভাগীয় দায়িত্বসমূহ পরিস্কারভাবে সংজ্ঞায়িত এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকেন্দ্রিক, কিন্তু বাস্তবে ই-গভর্নেন্স না থাকায় এবং ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে সব ধরনের কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষ করে কর নীতি এবং আইন প্রণয়ন কর অ্যাসেসমেন্ট, উপাত্ত এবং তথ্যের যথার্থতা নির্ধারণ এবং স্থানীয় কর সংগ্রহকারী অফিসগুলোর সাথে এনবিআরের সমম্বয়হীনতা এখনো বিদ্যমান। এ সমম্বয়হীনতার প্রভাব এনবিআরের সার্বিক রাজস্ব সংগ্রহের উপরেও পড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে কর ফাঁকিতে নিযুক্ত বা সম্ভাব্য কর ফাঁকির ঝুঁকি আছে এমন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তথ্য কোন বিভাগের কাছে থাকলেও অটোমেশন না থাকায় বিভাগসমূহ (আয়কর বা মূসক বা শুল্ক) সাধারণত এক অন্যের সাথে তথ্য বিনিময় করে না।

### ৩.৩ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

এনবিআর এর সাংগঠনিক কাঠামো সর্বশেষ যখন ১৯৯০ সালে অনুমোদিত হয়, তখন রাজস্ব আয় ছিল ৬,১৫২ কোটি টাকা, যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬২,০০০ কোটি টাকায়। কিন্তু এনবিআর এর জনবল সে অনুপাতে বৃদ্ধি করা হয়নি। ১৯৮৪ সালের পর ২০০৯ পযন্ত বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠির মামলার ফলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত ছিল। নিয়োগের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অগ্রগতি সত্ত্বেও রাজস্ব সংগ্রহের অনুপাতে প্রয়োজনীয় দক্ষ লোকবল না থাকা, সাংগঠনিক এবং এনবিআর এর ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতার দরুন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না।[৫৯]

**বক্স ৫: স্টাফদের পদোন্নতি এবং আইনের লংঘন**

২০১০ সালের ২৮ মে তারিখে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত সরকারি আদেশ অনুসারে, কর ইন্সপেক্টর পদকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তার পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর কর কর্মকর্তার নিয়োগ এবং পদোন্নতি 'Tax department (2nd class officer and staff) appointment rules, ১৯৯৫' দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এর ধারা ২(ডি)(খ) অনুসারে, ইন্সপেক্টরের শূণ্য পদের ৫০ শতাংশ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ মাধ্যমে এবং বাকি ৫০ শতাংশ শূন্য পদ বিদ্যমান ইন্সপেক্টরদের মধ্য হতে যোগ্যদের পদোন্নতির পূরণের বাধ্যতা রয়েছে। তাছাড়াও, আইন অনুযায়ী নিয়োগের জন্য তিনটি জাতীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেয়ার বিধান থাকলেও তা করা হয় নি। তথাপি, আইন লংঘন করে চাকুরিরত ইন্সপেক্টরদের মধ্য হতে ৯৩টি শূন্য পদের সবগুলো পূরণের জন্য ২০১০ সালের ১৪ই জুন এনবিআর গেজেট জারি করে। বিদ্যমান আইন অনুযায়ী দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে নিয়োগের জন্য পিএসসি হতে অনুমোদন নেয়ার বিধান থাকলেও কার্যক্ষেত্রে তা নেয়া হয়নি। তাছাড়াও, এ নিয়োগ বাবদ অবৈধ অর্থের লেনদেনের সাথে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সংযোগ ও ক্ষমতার অপবব্যহারের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। যদিও এনবিআরের এ ধরনের পদে নিয়োগের স্বাধীনতা থাকা উচিৎ, কিন্তু বিদ্যমান আইন লংঘন কেন করা হলো তার জবাব এখন পর্যন্ত এনবিআর দেয় নি। (সূত্র: মূখ্য তথ্যদাতা)

[৫৯] http://www.mof.gov.bd/mof2/budget/07_08/mtbf/4.pdf

চেয়ারম্যানের পাশাপাশি বোর্ডের ৮ জন সদস্যের ৪ জন আয়কর এবং ৪ জন শুল্ক এবং মূসক প্রশাসনের কমিশনার থেকে কমিশনার থেকে সদস্য পদে উত্তীর্ণ হন। ঢাকায় মূসক কমিশনারেটের অধীনস্থ অফিসগুলোতে বর্তমানে ৪০ জন ইন্সপেক্টর প্রায় ৪ লাখ (গড়ে প্রতি ১জনে ৪০ হাজার ফাইল) মূসক রেজিস্টার্ড ব্যবসায়িক প্রতিনিধির ফাইল নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিটি সার্কেলে গড়ে ১জন ইন্সপেক্টর ৭,০৮৪টি আয়কর ফাইল তদারকিতে নিয়োজিত। বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠির মামলার দরুণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া ১৯৮৪ সাল থেকে স্থগিত হয়ে আছে।

উল্লেখ্য, করদাতা নির্ধারণ ও রেজিস্ট্রেশন, কর অ্যাসেসমেন্ট এবং অন্যান্য কর সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাথমিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর পদে কোনো নিয়োগ দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে পিএসসি'র মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের কারণে স্টাফের ঘাটতি প্রকট নয়। ২৯তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ৯০ জন কর্মকর্তা নিয়োগ পেয়েছে, যেখানে ২২% পদ খালি ছিল এবং মূসক সেকশনের মাঠ পর্যায়ে প্রায় ৫০% পদ খালি রয়েছে।

অবশেষে ২০১০ সালে দ্বিতীয় শ্রেণী পদে নিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে, এ নিয়োগের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে দুর্নীতি এবং আইন লংঘনের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০২-০৩ অর্থবছর পর্যন্ত যথাক্রমে এনবিআর এবং শুল্ক এবং মূসক বিভাগের ২য় শ্রেণীর পদে ২২.১ শতাংশ ও ৪৭.৯ শতাংশ পদ (সুপারিন্টেন্ডেন্ট) খালি ছিল; আয়কর বিভাগে এ হার ছিল ৩৫.১ শতাংশ পদ। ১৯৮৪ সাল থেকে শুল্ক এবং মূসক বিভাগে প্রথম শ্রেণীর প্রায় ২৯.৭ শতাংশ পদ এবং সর্বোচ্চ ২৭.৪ শতাংশ তৃতীয় শ্রেণীর পদ রয়েছে। যেহেতু প্রায় নিয়মিত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা পদে সরাসরি নিয়োগ হচ্ছে সেহেতু বর্তমানে এ পদে তেমন ঘাটতি নেই।

নিয়োগের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অগ্রগতি সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় দক্ষ লোকবল না থাকা, সাংগঠনিক এবং এনবিআরের ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতার দরুন রাজস্ব সংগ্রহ করা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে সম্ভব হচ্ছে না।[৬০] এনবিআরের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রধান দুর্বলতা হলো-

সুষ্ঠু ম্যানেজম্যান্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS) বা অটোমেশনের অভাবে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যকার সমন্বয়হীনতা;

- 'মুজিবনগর সরকার' এর কর্মচারী হিসেবে ভুয়া সার্টিফিকেট দেখিয়ে অযোগ্য লোকদের নিয়োগ;
- কর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অপর্যাপ্ত মনিটরিং, দুর্বল প্রতিশ্রুতি এবং জবাবদিহিতার ঘাটতি;
- কিছু কিছু স্টাফের অপ্রতিরোধ্য দুর্নীতি (দেখুন বক্স ৮);
- কর্মচারীদের এলাকাভিত্তিক (বরিশাল, কুমিল্লা, উত্তরবঙ্গ বা সিলেটভিত্তিক) ও দলবদ্ধভাবে পিএসআইসহ বিভিন্ন নিয়োগ, পদোন্নতির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ;
- উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীর আইন-কানুন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান না থাকা;
- নিম্ন বেতন কাঠামো ও কর্মদক্ষতার জন্য প্রণোদনার ঘাটতি। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে স্টাফদের প্রায় ৪০০ কোটি টাকার প্রণোদনা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া থাকলেও পরবর্তী সময়ে সামান্য পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ২০০৯-১০ অর্থবছরে চাহিদা অনুযায়ী প্রণোদনার অর্থ প্রদান করলেও তার যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, পুরস্কার বিতরণের ক্ষেত্রে আইন লজ্ঞনের অভিযোগ রয়েছে (দেখুন বক্স ৭);
- একই স্টাফের একই সার্কেল/জোনে দীর্ঘদিন চাকরি করা;
- শুল্ক বিভাগে সংশ্লিষ্টহীন বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কিছু লোককে আত্মীকরণ করা হয়; এবং
- অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক যোগাযোগ, প্রভাব এবং ঘুষের মাধ্যমে বদলিসমূহ করার অভিযোগ করা হয়।

অধিকন্তু, ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে এনবিআর পরিচালনার ফলে এ প্রতিষ্ঠানের বিপুল পরিমাণ স্টাফকে শুধুমাত্র অফিস ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত রাখতে হচ্ছে। সার্বিকভাবে কোন এমআইএস এবং অন্যান্য কাজে অটোমেশন না থাকায় কর সংগ্রহকারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।

**বক্স ৬: মানব সম্পদের ঘাটতি এবং দুর্বল জবাবদিহিতা**

চট্টগ্রাম শুল্ক হাউজের রাজস্ব সংগ্রহ ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৭৩.২২ বিলিয়ন হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৮.০৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ২০০৭ সালে ৯৪৪টি পদের সংখ্যা কমিয়ে ৭৯২টি করা হয়েছে যার মধ্যে প্রায় ২৫ শতাংশ পদ এখনো শূন্য। এমনিতে ১৯৮৪ সালের পর হতে ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে, ৬৫টি সহকারী কর কমিশনার পদের মধ্যে ১০টি পদে সরাসরি নিয়োগ দেয়া হলেও ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পদোন্নতির মাধ্যমে বাকি ৫৫টি পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ইতিমধ্যে শুল্ক হাউজকে পৃথক আমদানি এবং রপ্তানি শাখায় বিভক্ত করা, শুল্কায়ন বিভাগে অটোমেশন চালু, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে স্ক্যানার মেশিন চালু করা হয়েছে। কিন্তু, মানব সম্পদের ঘাটতির ফলে শুল্কায়ন পদ্ধতি বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে, বিশেষ করে পণ্য ছাড়ের বিভিন্ন কাগজপত্র জমা এবং পণের কায়িক পরীক্ষা, পণ্যের ভ্যালুয়েশন এর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাপ এবং স্টাফরা বিভিন্ন ধরনের হয়রানি ও শুল্ক ফাঁকির ন্যায় ঘটনার সাথে জড়িত থকার অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন অনুসন্ধান এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখা গেছে, শুল্কায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পণ্যের ধরন এবং মূল্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্যাকেজে ঘুষের লেনদেন করা হয়ে থাকে। একজন কাস্টমস ইন্সপেক্টর মাত্র ১০-১২ হাজার টাকা বেতনে চাকরি করলেও একাধিক গাড়ি, সুইমিং পুলসহ নিজস্ব বিশাল বাড়ির মালিক কিভাবে হয়েছে তার কোন উত্তর নেই (সূত্র: মুখ্যতথ্য দাতা, ২০১০)।

[৬০] http://www.mof.gov.bd/mof2/budget/07_08/mtbf/4.pdf

**বক্স ৭: পুরস্কার প্রদানে অনিয়ম**

'আয়কর অর্ডিন্যান্স ১৯৮৪ এর সেকশন-১৮৪ডি, ২০০০ সনে সংযুক্ত' অনুসারে, বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং এর অধীনস্থ কর অফিসের কোনো নির্দেশিত ব্যক্তি ক. কর সংগ্রহে এবং কর আত্মসাৎ চিহ্নিত করতে অনন্য পারফরমেন্স; খ. অন্য কোন ব্যক্তি যদি কর আত্মসাৎ চিহ্নিত করতে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে; গ. কোন নির্দিষ্ট অর্থবছরের রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি আদায় করলে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হতে পারেন। এ ধরনের পুরস্কার অনুমোদনের ক্ষেত্রে 'আয়কর পুরস্কার আদেশ ১৯৮০' অনুসরণ করা হয়, যার আওতায় কর কমিশনার এবং এর চেয়ে উর্ধ্বতন পদের কোনো কর্মকর্তা এ পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হতে পারবেন না। কিন্তু সরকারি এ আদেশ না মেনে, এমনকি আইনের সংস্কার না করেই, মহাপরিচালক-সিআইসি (কমিশনার পদের সমতুল্য) নিজের নামসহ অন্যান্য সকল স্টাফ (পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্য বা অযোগ্যসহ) কে ৭৪ লাখ টাকার পুরস্কার প্রদানে বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করে (সূত্র: ফাইল নং ০৩(০১)-২৪/NBR/CIC/২০০৮)। এ ধরনের পুরস্কার সিআইসি'র স্টাফরা ২০০৪ সাল থেকে গ্রহণ করেছে। এ প্রেক্ষিতে বিদ্যমান আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় বিধায় নিরীক্ষণ কর্মকর্তা (স্থানীয় এবং রাজস্ব অডিট ডিপার্টমেন্ট) ২০১০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারীতে ৩.৯৮ কোটি টাকার একটি লিখিত অডিট আপত্তি উত্থাপন করে। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের ২ ফেব্রুয়ারী আয়কর বিভাগের ১০০ কর্মকর্তা পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয় এবং অভিযোগ রয়েছে যে, পুরস্কার বিতরণের ক্ষেত্রে পুরস্কারের ১০ শতাংশ অর্থ বা প্রায় ১.২৫ কোটি টাকা ঘুষ হিসেবে এক বা একাধিক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা গ্রহণ করেছেন। একই ধরনের অনৈতিক পুরস্কার এবং কমিশনের চর্চা এলটিইউ, শুল্ক এবং মূসক বিভাগেও বিদ্যমান। রাজস্ব বোর্ডের সিআইসি বা এলটিইউ এর অফিসারদের প্রতি বছরে যে ১৫/২৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেয়া হয় তা একবারে বা এক মঞ্জুরী আদেশের মাধ্যমে দেয়া হয় না। প্রতি বছরে ৪/৫ বার দেয়া হয় এবং সেগুলো যোগ করেই একেকজন অফিসারের বছরে মোট পুরস্কার প্রাপ্তি হয় ১৫/২৫ ল টাকা।

(সূত্র: মূখ্য তথ্যদাতা, ২০১০)

### ২.৩.১ নিয়োগ ও পদোন্নতি

সর্বশেষ ২৯তম বিসিএসের মাধ্যমে ৯০জন কর্মকর্তাকে এনবিআরের বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ দেয়া হলেও, করদাতা নির্ধারণ রেজিস্ট্রেশন, অ্যাসেসমেন্ট এবং অন্যান্য কর সংক্রান্ত বিষয়ে তদারকির জন্য প্রাথমিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হল ইন্সপেক্টররা। অথচ, ১৯৮৪ সনের পর ২০০৯ পর্যন্ত ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা পদে কোনো নিয়োগ দেয়া হয়নি। গত ২৫ বছরে অনেক মামলা দায়ের করে ইন্সপেক্টর ও সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে নিয়োগ স্থগিত রাখা হয়েছিল। তবে, এনবিআর এ ২০১০ এ ইন্সপেক্টরের শূণ্য পদে ইতোমধ্যে ১০৪জন ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে ২০১১ সালের জুলাই-আগষ্ট মাসের মধ্যে ৫০০ ইন্সপেক্টর নিয়োগ দেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। (এনবিআর, ২০১১) তবে ইতোমধ্যে ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘন এবং অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে (দেখুন বক্স ৫)। পদোন্নতির ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে পারফরমেন্স এপ্রেইজাল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কর্মীদের পদোন্নতি দেয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায়ে অগ্রগতি হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ভবিষ্যতে পদোন্নতি দিতে এনবিআর পর্যায়ক্রমে ৫০০ ইন্সপেক্টরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর নির্দিষ্ট পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণদের পদোন্নতি প্রদানের কথা এনবিআর জানিয়েছে।

---

### ৩.৩.২ এনবিআর সদস্যদের কর্মদক্ষতা

এনবিআরের সদস্যরা সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখার দায়িত্বে নিয়োজিত। যেহেতু তাদের মতামত এবং সিদ্ধান্তের ওপর কর রাজস্ব সংগ্রহের সফলতা নির্ভরশীল, তাই তাদেরকে অবশ্যই সক্ষম, গতিশীল এবং মেধাবী হওয়া জরুরি। কিন্তু, বর্তমানে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বোর্ড সদস্য পদে পদোন্নতি দেয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই পদোন্নতিপ্রাপ্তদের পেশাগত জ্ঞানের স্বল্পতা এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তের ওপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয়। বোর্ডের চেয়ারম্যানের শুধুমাত্র নীতিগত পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা থাকলেও তাকে সদস্যদের বিভিন্ন দৈনন্দিন কাজে নিয়মিত ব্যস্ত থাকায় প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা হ্রাস পাচ্ছে।

### ৩.৪ অ্যাসেসমেন্ট কর্মকর্তার একচ্ছত্র ক্ষমতা ও জবাবদিহিতা

ক্লিটগার্ডের সূত্র মতে, জবাবদিহিতার ঘাটতির ফলেই দুর্নীতির বিস্তার ঘটে। প্রাক্তন এনবিআর চেয়ারম্যান এর মতে, "একটি শক্তিশালী দুর্নীতির নেটওয়ার্ক থাকার ফলে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, বর্তমান পর্যন্ত খুব কম সংখ্যক স্টাফই দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে"[৬১]। কর বিভাগের অফিসারগণ নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে রাজস্ব বিরোধী কাজ করলে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছেনা। বর্তমানে করদাতাগণ মূলত কর বিভাগের অফিসার ও ষ্টাফদের সহযোগিতায় কর ফাঁকি দেন। আগে কর বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ সরকারের রাজস্ব সংগ্রহে ক্ষতি সাধন করলেও তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো, কিন্তু কয়েক বছর যাবত তা এক রকম বন্ধ করেই দেয়া হয়েছে। ফলে, বর্তমানে কর বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক রাজস্ব সংগ্রহ বিরোধী কাজ করার প্রবণতা অনেক বেড়ে গেছে। এনবিআর কর অ্যাসেসসমেন্ট স্টাফের একচ্ছত্র ক্ষমতা কমালেও তাদের হস্তক্ষেপ বা কাজের পরিধি সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ না করায়

[৬১] ২০০৯ সালের ২ জুলাই টিআইবি'এর গবেষকের সাথে সাক্ষাৎকার প্রদান করেছিলেন

এখনো একচ্ছত্র ক্ষমতা বিদ্যমান। কোন কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা (উপ-কর কমিশনার, পরিদর্শী যুগ্ম কর কমিশনার বা কমিশনার) কোন কোন ক্ষেত্রে অডিটের নামে ঘুষ দাবি করেন এবং সেলফ অ্যাসেসমেন্টের অডিট এড়িয়ে কর ফাঁকি দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ইন্সপেক্টর বা কর কর্মকর্তাকে ঘুষ দেয়। একজন প্রাক্তন এনবিআর চেয়ারম্যানের মতে, গত ৩৫ বছরে এনবিআরের কর কর্মকর্তা কর্মচারীদের দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থের পরিমাণ জাতীয় বাজেটের প্রায় সমান।

তাছাড়াও একজন একজন প্রাক্তন বোর্ড সদস্য 'স' কর্তৃক ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছরে কর বৈতনিক সার্কেল-৭ ও কর জোন-৪ এ ২০০০-০১ অর্থ বছর হতে ২০০৬-০৭ অর্থবছরের কর প্রদান করার পর আয় এবং সঞ্চয়ের ঘোষণার সাথে ব্যাপক অমিল পাওয়া যায়। অনুসন্ধানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ অর্থ এবং ৪ কোটি ৩১ লাখ ৮৬ হাজার ১১৬ টাকা কর ফাঁকির প্রমাণ পাওয়া যায়।[৬২] এ ধরনের দুর্নীতির সাথে জড়িত থাকলেও পরবর্তী পর্যায়ে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বা কোনো শাস্তি প্রদানের কথা জানা যায়নি।

**বক্স ৮: কর সংগ্রহকারীদের দুর্নীতি**

**কেস-১:** এনবিআরের চেয়ারম্যান 'ক' এর আমলে একজন কমিশনার 'খ' মাত্র ৫৩ লাখ টাকা কর দিয়ে প্রায় ২১ কোটি টাকা অবৈধ আয় সাদা করে। কিন্তু, দায়ী কমিশনারকে এজন্য বিভাগীয় কোন শাস্তির সম্মুখিন হতে হয় নি এবং তিনি এখানো চাকরিতে বহাল আছেন। (সূত্র: মূখ্য তথ্যদাতা, ২০০৮)

**কেস-২:** সর্বশেষ তত্ত্বধায়ক সরকারের সময়ে (২০০৭-০৮), দুদকের টাস্কফোর্স সদস্যরা এনবিআরের একজন সদস্যের জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত প্রায় ৩.৫ কোটি টাকা ব্যাংকে গচ্ছিত পাওয়া যায়। কিন্তু উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সহায়তায় তিনি কোন ধরনের আইনি পদক্ষেপ হতে রক্ষা পান। (সূত্র: দুদক, ২০০৮)

**কেস-৩:** চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজের একজন সুপারিন্টেন্ডেন্ট মাসে গড়ে ১৬-২০ হাজার টাকা বেতন ও অন্যান্য সুবিধা পেলেও তাদের প্রায় সকলের মাসিক অবৈধ উপার্জন লাখ লাখ টাকা। প্রায় সকল সুপারিন্টেন্ডেন্টের ব্যক্তিগত এক বা একাধিক গাড়ি, বাড়ি, এমনকি সুইমিং পুলসহ হিলসাইড বাড়ি এবং প্লট রয়েছে (সূত্র: গবেষণা অনুসন্ধান, ২০১১)

সার্বজনীন সেলফ অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি চালুর পরও অনেক ক্ষেত্রে আইনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকায় কর কর্মকর্তা এ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র ক্ষমতা ভোগ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে চাপ বা চাকরি হারানোর ভয়ে তাঁরা এ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পারে না। পূর্বে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এ্যাসেসমেন্টের জন্য স্টেনোগ্রাফারকে নির্দেশনা প্রদান করলেও এখন প্রায় সকল কর্মকর্তা এ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট তৈরির জন্য স্টেনোগ্রাফারের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে। কোন কোন ক্ষেত্রে, অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টের জন্য পরিদর্শী অতিরিক্ত কমিশনার বা কমিশনারকে ঘুষ প্রদান করতে হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। খুব কম সংখ্যক এ্যাসেসমেন্ট কর্মকর্তা ঘুষ গ্রহণ করেন না।

**বক্স ৯: অকার্যকর কর পরিদর্শন পরিদপ্তর**

কর বিভাগের স্টাফদের দ্বারা সংঘটিত রাজস্ব ক্ষতি চিহ্নিত করে হৃত রাজস্ব উদ্ধার করা এবং এ সকল রাজস্ব তির সাথে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া/তিরস্কার করার জন্য আয়কর অধ্যাদেশের ৬(১)(এএ) ধারা মোতাবেক কর বিভাগের অভ্যন্তরীণ অডিট ডাইরেক্টরেট বা কর পরিদর্শন পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। অথচ কর পরিদর্শন পরিদপ্তরের কার্যক্রমকে নিয়মিত সম্পাদন ও মনিটরিং করার উদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে অতিরিক্ত সচিব পদের মর্যাদা সম্পন্ন একজন সদস্য কর্মরত আছেন, তার অধীনে রাজস্ব বোর্ডে একজন প্রথম সচিব, একজন দ্বিতীয় সচিব, কয়েকজন কর্মচারীও আছেন। কিন্তু, এ পরিদপ্তরকে আয়কর উকিল এবং কর বিভাগের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ উভয়ের যোগসাজশে অকার্যকর করে রাখা হয়েছে। কর পরিদর্শন পরিদপ্তরের মহা পরিচালক, ৫ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক, ৪ জন উপ মহাপরিচালক বিগত ১ বছরে কতটি কর সার্কেল পরিদর্শন করেছে এবং কতটি কর ফাকির বিষয় উদঘাটন করে কত জন করদাতা এবং কত জন কর অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করেছে, পরিদর্শী রেঞ্জ কর্মকর্তাগণ (অর্থাৎ সার্কেল অফিসারদের দৈনন্দিন কাজ দেখা-শুনার দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শী যুগ্ম ও অতিরিক্ত কর কমিশনার গণ) নিয়মিত সার্কেল ভিজিট করে অনিয়ম চিহ্নিত করে রিপোর্ট দাখিল করে কিনা, সেগুলোর উপর কর পরিদর্শন পরিদপ্তর এবং রাজস্ব বোর্ড কি ব্যবস্থা নিয়েছে, মহাপরিচালক আয়কর অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক রাজস্ব বোর্ডে বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করে কিনা, এ সকল বিষয় সরেজমিনে যাচাই করলেই নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবে যে, কর পরিদর্শন পরিদপ্তরের কার্যক্রমকে সুপরিকল্পিতভাবে অকার্যকর করে রাখা হয়েছে। এমনকি রাজস্ব বোর্ডের কর পরিদর্শন শাখায় গেলে সেখানে প্রতিটি কর অঞ্চলের রেঞ্জ ভিত্তিক যে সকল ফাইল আগে রক্ষনাবেক্ষণ করা হতো বর্তমানে সেগুলো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাস্তবে রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত কাজের বিরুদ্ধে এনবিআরের কতিপয় দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের অলিখিত হস্তক্ষেপের কারণে দূর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দেয়া হচ্ছে না, কারণ এতে অবৈধ অর্থ উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ ২০০০ সালে তৎকালীন এনবিআর চেয়ারম্যান 'এম' কর পরিদর্শন পরিদপ্তরকে বিলোপ করতে চাইলে তখন আয়কর বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এক জোট হয়ে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তা ঠেকিয়েছিল। আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং কর ফাঁকিবাজ করদাতা, কর ফাঁকিতে সাহায্যকারী উকিল এবং অফিসারদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আর তার অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে কর পরিদর্শন পরিদপ্তরকে কার্যকর করা। (মূখ্য তথ্যদাতা, ২০১১)

কর পরিদর্শন পরিদপ্তর অকার্যকর থাকায় কর ফাঁকি রোধে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না (দেখুন বক্স ৯)। ফলে কর ফাঁকি অপ্রতিরোধ্য গতিতে চলছে।

---

[৬২] দুদক ২০০৯

## ৩.৫ কর না দেয়ার প্রবণতার কারণসমূহ

এনবিআর করদাতা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে অনেক অর্থ ব্যয় করে থাকে। এনবিআর এর ব্যাপক প্রচারণার অংশ হিসেবে শর্ট ফিল্ম প্রদর্শন এবং অন্যান্য পদ্ধতি গ্রহণ করলেও এর সাফল্য তুলনামূলকভাবে কম। বর্তমানে বিদ্যমান টিআইএনধারীদের মাত্র এক-তৃতীয়াংশের কম কর প্রদান করছে। এর প্রধান কারণসমূহ হল: ১) কাঙ্ক্ষিত নাগরিক সুবিধা না পাওয়া; ২) প্রদত্ত কর সঠিকভাবে ব্যবহারে সরকারের ওপর আস্থার ঘাটতি; ৩) জটিল কর সংগ্রহ ব্যবস্থা এবং কর সংগ্রহকারীর সাথে সম্ভাব্য করদাতার যোগসাজশ; ৪) কর ফাঁকি বা আত্মসাতের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত না করা; ৫) কর প্রদানে জাতীয় সংস্কৃতি ও সুশাসনের অভাব; ৬) অটোমেশন এবং ই-গভর্নেন্সের অভাব; এবং ৭) কর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আর্থিক প্রণোদনার অপ্রতুলতা।

## ৩.৬ নাগরিক সনদ

নাগরিক সনদ তৈরির ক্ষেত্রে এর বিষয়বস্তু, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্বেই জনসাধারণকে অবহিত করা হলেও এতে নিম্নোক্ত ঘাটতি রয়েছে-

### ক. সনদ প্রস্তুতি

- খসড়া নাগরিক সনদ তৈরির পূর্বে করদাতা বা সুবিধাভোগীদের সাথে কোনো ধরনের আলোচনা বা মতামত গ্রহণ না করা;
- এনবিআরের সকল স্তরে সনদ বাস্তবায়নে সব ধরনের স্টাফদের প্রতিশ্রুতি এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয় নি, এমনকি করদাতাদের অনেকে সনদ সম্বন্ধেও অবহিত নয়;
- প্রকাশিত সনদ মেনে চলার ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুপস্থিত।

### খ. সনদের বিষয়বস্তু

প্রত্যেকটি সনদে কতগুলো সুনির্দিষ্ট অংশ থাকা বাধ্যতামূলক। সংজ্ঞার আলোকে একটি মানসম্পন্ন নাগরিক সনদের বিষয়বস্তুর মধ্যে এনবিআর এর নাগরিক সনদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সেবা গ্রহণকারীর বিবরণ, সেবাসমূহের মানোন্নয়নে মূল্যায়ন বা পদক্ষেপ, অভিযোগের ব্যবস্থাপনা এবং সনদ প্রস্তুতের তারিখ অন্তর্ভুক্ত না করা। এছাড়াও, এনবিআরের কার্যক্রম পরিচালনায় অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাসমূহ হলো, বিগত সময়ে সঠিক সময়ে সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম না হওয়া; কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি না হওয়া; এনবিআরের উচ্চ পর্যায়ে অ-কারিগরি ও অনভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের নিয়োগ প্রদান; দুর্বল ফাইল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি; নির্ভরযোগ্য তথ্যের অনুপস্থিতি; অযথার্থ কর সনাক্তকরণ পদ্ধতি; দ্বৈত কর এবং হয়রানি। উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি এনবিআর বিভিন্ন ধরনের সংস্কার বা আইনের পরিবর্তন করছে, কিন্তু স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং করদাতা-বান্ধব সেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান। এনবিআর -এর পাশাপাশি আয়কর, মূসক এবং শুল্ক প্রশাসনের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় নীতিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং তার কারণসমূহ পরবর্তী অধ্যায়সমূহে চিত্রিত করা হয়েছে।

## চতুর্থ অধ্যায়
# আয়কর বিভাগঃ চ্যালেঞ্জসমূহ

আয়কর অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৪ অনুসারে আয়করের উৎসসমূহ হলো, বেতন, সিকিউরিটির ওপর সুদ, গৃহসম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয়, কৃষি আয়, ব্যবসা বা পেশা লব্ধ আয়, মূলধন লাভ প্রভৃতি। আয়কর বিভাগ বিভিন্ন পদের[৬৩] সমন্বয়ে সৃষ্টি প্রাথমিক পর্যায়ে ইন্সপেক্টর কর অ্যাসেসমেন্ট, আপিল ট্রাইব্যুনাল, এলটিইউ এবং গোয়েন্দা বিভাগে কর্মরত। সেকশন ১৭৬৪ অনুসারে, আয়ের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিশ্বব্যাপী আয় এবং বাংলাদেশে অধিবাসীর আয়; একজনকে[৬৫] বাংলাদেশ নিবাসী বলা যাবে, যদি সে বাংলাদেশে কোন অর্থবছরে ১৮২ দিন বা ততোধিক সময় এবং ১ বারের অধিক সময়কালে অবস্থানের ক্ষেত্রে প্রতি বছরে গড়ে ৯০ দিন করে বিগত ৪ বছরে একনাগাড়ে গড়ে সর্বমোট ৩৬৫ দিন অবস্থান করে। যদিও আয়কর অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৪ এ কর্পোরেট কর বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই, তথাপি সার্বিক আয়করে কর্পোরেট[৬৬] আয়কর সর্বোচ্চ ৬২ শতাংশ অবদান রাখে। আয়করের অবদান সার্বিক রাজস্বে বৃদ্ধি পেলেও গত ২৮ বছরে (১৯৮২-৮৩ অর্থবছর ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত) ৬.২ শতাংশ হতে ২৭.১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

**রেখা চিত্র ৭: এনবিআরের কর রাজস্ব সংগ্রহে আয়করের অবদান (%)**

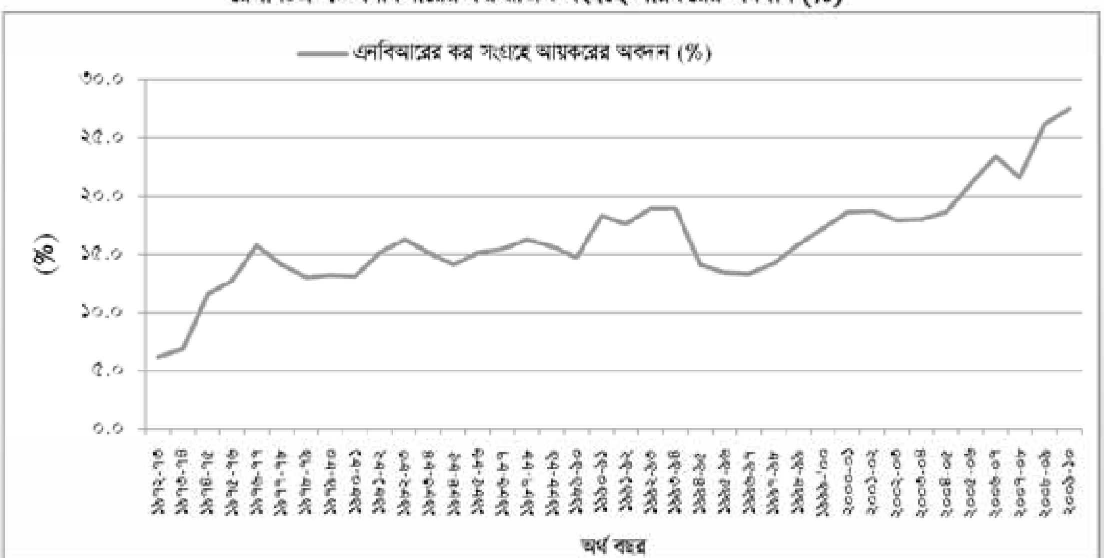


সূত্রঃ এনবিআর, ২০১০

---

৬৩ ডিরেক্টর জেনারেল, ইন্সপেকশন (কর) কর কমিশনার (আপীল), কর কমিশনার (এরটিউইউ), ডিরেক্টর জেনারেল (প্রশিক্ষণ), ডিরেক্টর জেনারেল (সেন্ট্রাল ইন্টিলিজেন্স সেল-সিইসেল), কর কমিশনার, সহকারী কর কমিশনার (আপীল এবং ইন্সপেকশন), যুগ্ম কর কমিশনার (আপীল এবং ইন্সপেকশন), ডেপুটি কর কমিশনার, সহকারী কর কমিশনার, অতিরিক্ত কর কমিশনার, কর ইন্সপেক্টর।

৬৪ আয়কর অর্ডিন্যান্স ১৯৮৪

৬৫ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ অনুসারে, ব্যক্তিগত ও কোম্পানী কায়েন্টসরা কর প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়াবলী বিবেচনা করা হয়, বিষয়াবলীগুলো হলোঃ ক) করদাতা চিহ্নিতকরণ নম্বর থাকতে হবে; খ) If total income of any individual other than female taxpayers, senior taxpayers of 65 years and above and retarded taxpayers during the income year exceeds Tk. 1,65,000 ; c) any female taxpayer or senior taxpayer of 70 years and above and retarded taxpayer exceeds Tk. 1,80,000; d) If any person was assessed for tax during any of the 3 years immediately preceding the income year; e) কারো ফোন সংযোগ অথবা ব্যবসার জন্য ট্রেড লাইসেন্স আছে; f) চেম্বার অব কমার্স এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং ট্রেড সংগঠনের সদস্য; ম) ডাক্তার, আইনজীবি এবং আয়কর practitioner, সি এ, কস্ট এবং ম্যানেজমেন্ট একাউন্টস, প্রকৌশলী, আর্কিটেক্ট এবং সার্ভেয়ার এর রেজিস্ট্রেশন আছে, h) A person who lives in any city corporation/paurashava/divisional HQ/district HQ and owns a building of more than one storey and having plinth area exceeding 1,600 sq. feet/owns motor car/owns membership of a club registered under VAT Law or participates in a tender; i) Candidate for Union Council, Municipality, City Corporation or Parliament.

৬৬ Income from Business or Profession (section 28, 29 and 30) are i) profit and gains of any business or profession; ii) income of trade or professional bodies like CA, MCCI, FBCCI etc.; iii) value of any benefit or perquisites arising from business or profession, receipt back of loss, bad debt or expenditure and unpaid trading liability [section 19 (15)]; iv) Income of depreciated assets s19 (16); v) Insurance, salvage or compensation money [section 19(18)]; vi) Income from sale of asset of capital nature s.19(20); and vii) income from transfer of export quota [Section 19(23)].(এনবিআরের ওয়েবসাইট, ডিসেম্বর ২০১০)

### উৎসে আয়কর সংগ্রহ

বাংলাদেশে উৎস আয়কর সাধারণত কর কর্তন বলে পরিচিত।[৬৭] এ পদ্ধতির আওতায় সরকারি এবং বেসরকারি উভয় লিমিটেড কোম্পানি এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহ উৎসে আয়কর প্রদান ও সরকারি কোষাগারে তা জমা প্রদানে আইনগতভাবে বাধ্য। করদাতা ক্ষমতা সংরক্ষণকারী কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত সার্টিফিকেটের মাধ্যমে অ্যাসেসকৃত করের বিপরীতে ছাড় পায়।

### কর প্রণোদনা: কর অবকাশ[৬৮]

শর্তসাপেক্ষে বিভিন্ন শিল্পের (যেমন, বস্ত্রকলের যন্ত্রপাতি, পাটজাত পণ্য, উচ্চ মূল্যের গার্মেন্টস) জন্য সম্প্রসারিত অবচয় (১জুলাই, ২০০৮ হতে ৩০ জুন, ২০১২ পর্যন্ত) অনুমোদনযোগ্য।[৬৯] বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, অনুমোদিত বিনিয়োগ হল সর্বমোট আয়ের ২৫% বা ৫,০০,০০০ টাকা বা যেটি কম। এছাড়াও, সম্প্রসারিত অবচয় শিল্পায়ন ত্বরান্বিত এবং উদীয়মান নতুন শিল্পসমূহ প্রতিযোগিতাপূর্ণ এবং সম্প্রসারণে উৎসাহিত করণের লক্ষ্যে প্রদান করা হয়। গত দুটি বাজেটে (অর্থবছর ২০০৮-০৯ এবং ২০০৯-১০) আয়কর বিভাগে গৃহীত বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপগুলোর মধ্যে কর ক্যালকুলেটর প্রবর্তন, দু'পৃষ্ঠার রিটার্ন ফরম তৈরি, জাল টিআইএন ব্যবহারের ক্ষেত্রে শাস্তির ব্যবস্থা, ২০০৯ সালের জুলাই মাসে এলটিইউতে অন-লাইন রিটার্ন দাখিলের সুযোগ, জাতীয় আইডি প্রকল্পের ডাটাবেজের সাথে ই-যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, কোম্পানি করদাতাদের ন্যূনতম কর ধার্য করা অন্যতম। যদিও উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু অদ্যাবধি কর-বান্ধব পরিবেশ এবং কর ফাঁকি বা আত্মসাৎ এখনো বন্ধ হয় নি।

### ৪.১ আয়কর বিভাগের কার্যক্রমে প্রধান প্রতিবন্ধকতা

- আয়করের নিম্ন অবদান, সার্বিক রাজস্ব সংগ্রহের মাত্র এক-চতুর্থাংশ;
- এনবিআরের স্টাফ এবং কর্পোরেট/ব্যক্তিখাতের মধ্যে বিশ্বাসের ঘাটতি;
- হয়রানি এবং দুর্নীতির শিকার হওয়ার ভয় এবং অস্বচ্ছ কর ব্যবস্থা;
- ইলেকট্রনিক কর প্রদান পদ্ধতি এখনো চালু না হওয়া এবং সরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে কর প্রদানে হয়রানি;
- কর অ্যাসেসমেন্ট এবং প্রদানের ক্ষেত্রে দেশব্যাপী কেন্দ্রের অনুপস্থিতি;
- নাগরিকদের কর প্রদানের ক্ষেত্রে প্রণোদনার অভাব;
- স্বার্থের সংঘাত - চাকরিরত অবস্থায় ৫০ শতাংশের অধিক কর সংগ্রহকারী স্টাফ কর উপদেষ্টা হিসেবে বর্তমানে কাজ করছে;
- দলভিত্তিক করদাতার ধরন অনুপস্থিত।

### ৪.২ কর (Tax) আইডিন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) রেজিস্ট্রেশন এবং দুর্নীতি

টিআইএন রেজিস্ট্রেশন করদাতা হওয়ার প্রাথমিক শর্ত। এনবিআর প্রদত্ত তথ্য মতে বর্তমানে ২.৬২ মিলিয়ন লোকের টিআইএন আছে, কিন্তু মাত্র ৬৬ মিলিয়ন বা ২৫ শতাংশ লোক কর প্রদান করে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এফজিডিতে (এপ্রিল, ২০১০) অংশগ্রহণকারী একাধিক করদাতা টিআইএন সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে কর স্টাফ কর্তৃক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে গড়ে ১-২ হাজার টাকা এবং কোম্পানির ক্ষেত্রে ৫-১০ হাজার টাকা ঘুষ নেয়ার উল্লেখ করেছেন। প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের সুযোগ না দিয়ে পুরোপুরি অটোমেটেড ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে এ ধরনের অবৈধ অর্থের লেনদেন বন্ধ করা সম্ভব। যদিও আইন অনুসারে, সরকার কর্তৃক বরাদ্দ জমি, গাড়ি, বাড়ি এবং এপার্টমেন্ট ক্রয়, ০.৫ মিলিয়ন টাকার অধিক ঋণ নিলে সংশ্লিষ্ট ভোক্তার টিআইএন প্রদর্শন বাধ্যতামূলক তবে এনবিআর দৈবচয়নের ভিত্তিতে পরীক্ষা করে জাল টিআইএন ব্যবহার চিহ্নিত করেছে।

**সারণি ৩: জাল টিআইএন ব্যবহারের হার (%)**

| | জরিপকৃত টিআইএন | জাল টিআইএন | |
|---|---|---|---|
| | সংখ্যা | সংখ্যা | শতকরা হার |
| জমি ক্রয় | ১৬৮ | ৮৫ | ৫০.৬০ |
| ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার | ৩৭ | ১৯ | ৫১.৩৫ |
| গাড়ি ক্রয় | ৭৩ | ২৪ | ৩২.৮৮ |
| এলসি খোলা | ৪২ | ১ | ২.৩৮ |
| ৫ লক্ষ টাকার উপরে ঋণ প্রদান | ৫১ | ২ | ৩.৯২ |
| সার্বিক | ৩৭১ | ১৩১ | ৩৫.৩১ |

সূত্র: এনবিআর, ২০০৯

[৬৭] বিস্তারিত পরিশিষ্ট ৬ এ দেখুন
[৬৮] বিস্তারিত পরিশিষ্ট ৭ এ দেখুন
[৬৯] http://www.nbr-bd.org/incometax.htm

৩৫১ টি টিআইএনধারীদের মধ্যে ৩৫.৩১ শতাংশ ভুয়া এবং এর মধ্যে সর্বোচ ৫১.৩৫ শতাংশ ক্রেডিট কার্ড, ৫০.৬ শতাংশ ভূমি ক্রয় এবং ৩২.৮৮ শতাংশ গাড়ি ক্রয়ে জাল টিআইএন ব্যবহার করে থাকে (সারণি ৩)[৭০]। এ প্রেক্ষাপটে এনবিআর ভুয়া টিআইএন ব্যবহারকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসলেও একমাত্র অনলাইন মনিটরিং বা অটোমেশনের মাধ্যমে এ ধরনের কার্যক্রম রোধ করা সম্ভব।

### ৩.৩ কর অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি

২০০৭-০৮ অর্থবছরে সার্বজনীন সেলফ অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি[৭১] চালু করা হয়। এ পদ্ধতিতে করদাতা নিজস্ব আয় এবং ব্যয় নিজেরাই হিসাব করতে পারে এবং তদুনাসারে কোন কর আইনজীবি বা সহকারী ব্যতীত কর রিটার্ন ফরম জমা দিতে পারে। সার্বজনীন সেলফ অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি চালু হওয়া সত্ত্বেও সেলফ অ্যাসেসমেন্ট, সেকশন ৮১, এর আওতায় সাময়িক অ্যাসেসম্যান্ট, সেকশন ৮২ এর আওতায় সঠিক রিটার্নের ভিত্তিতে অ্যাসেসমেন্ট; সেকশস ৮২বি এবং ৮৩'র আওতায় অ্যাসেসমেন্ট, এবং বেষ্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট-সেকশন ৮৪ এর আওতাধীন। রিটার্ন জমা দিতে ব্যর্থ হলে ক) সর্বশেষ অর্থ বছরের অ্যাসেসমেন্টকৃত মোট করের, ন্যূনতম ১০০০ টাকার ১০ শতাংশ শাস্তি হিসেবে প্রদান; খ) অনির্দিষ্ট সময় দেরি হলে প্রতিদিন ৫০ টাকা হারে জরিমানা প্রদান। এ অবস্থায়, কোনো কোনো করদাতার মনে বিভিন্ন অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতির কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তাই তারা হয়রানি এবং দুর্নীতির শিকার হওয়ার ভয়ে ভীত থাকে।

### সার্বজনীন সেলফ অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি

সার্বজনীন সেলফ অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহারকারী হচ্ছে ব্যক্তি করদাতা, যারা নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় এবং ব্যয় সাপেক্ষে নির্ধারিত কর প্রদান করে। এনবিআরের তথ্যানুসারে, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ০.৬৪ মিলিয়ন করদাতার প্রদত্ত ৭৩৭ কোটি টাকা করের মাত্র ১৭১ কোটি টাকা সার্বজনীন সেলফ অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে প্রদান করে। বাকি ৩৭৪ কোটি এবং ১৯২ কোটি টাকা যথাক্রমে সাধারণ অ্যাসেসমেন্ট ও সেলফ অ্যাসেসমেন্টের[৭২] মাধ্যমে প্রদান করে। এনবিআরের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী করদাতা কর্তৃক যে পরিমাণ করই দেয়া হোক না কেন তা বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করাই সার্বজনীন সেলফ অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। কর স্টাফরা দাখিলকৃত রিটার্নের মাত্র ১০ শতাংশ দৈবচয়নের ভিত্তিতে বোর্ডের অনুমতি সাপেক্ষে নিরীক্ষা (Audit) করেছিল। সে হিসেবে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দাখিলকৃত ৬,৫১,৯৭৪ টি রিটার্নের মধ্যে মাত্র ৮,৫৮৬টি রিটার্ন অডিট করেছিল। কি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এ ৮৫৮৬টি রিটার্ন অডিটের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তা করদাতারা জানতে পারেনি। কোনো সন্দেহ দূরীকরণে স্বচ্ছ পদ্ধতি এখনো নিশ্চিত করা হয়নি। সার্বজনীন সেলফ অ্যাসেসমেন্ট ও অন্যান্য সেলফ অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতিতে এখানো বিদ্যমান, যা নিম্নে আলোচনা করা হল:

**সারণি ৪: অ্যাসেস মেন্ট পদ্ধতির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ**

| সাধারণ চ্যালেঞ্জসমুহ | |
|---|---|
| ➡ ব্যক্তি এবং কোম্পানি করদাতার পৃথক রিটার্ন ফরম না থাকা<br>➡ কর কর্মকর্তার একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রয়োগ এবং অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে আইনের অপপ্রয়োগ<br>➡ যৌক্তিক ক্ষতি/অপচয় (যেমন উৎপাদনের অপচয় অংশবিশেষ) সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট অ্যাসেসমেন্ট কর্মকর্তার ধারণা না থাকা | |
| **সার্বজনীন সেলফ অ্যাসেস মেন্ট পদ্ধতি** | **সাধারণ ও সেলফ অ্যাসেস মেন্ট ও বেষ্ট জাজমেন্টে** |
| ➡ সব জমাকৃত অ্যাসেসমেন্ট ফরমের ১০% এর নিরীক্ষা করা; এই ১০% বাছাই করার জন্য কোনো নির্ধারিত মানদণ্ড না থাকা।<br>➡ করদাতার রিপোর্টকৃত সমস্যার ধরন সম্পর্কে রেকর্ড না থাকা<br>➡ কর স্টাফের সাথে যোগসাজশে অডিট পদ্ধতিকে ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহার। | ➡ অনেক ক্ষেত্রে ঘুষ ছাড়া কর দিতে চাইলে কর সংগ্রহকারী কর্তৃক অসৌজন্যমূলক আচরণ ও হয়রানি, অযৌক্তিক কর হার নির্ধারণ। |

---

৭০ www.jaijaidin.com/details.php?nid=139788

৭১ Assessment Procedures: a. for returns submitted under USA Scheme, the acknowledgement slip is determined to be an assessment order. USA is of course subject to audit; b. for a return submitted under normal scheme, assessment is made after hearing.

৭২ Under sections 83A and 83AA/rule 38 and under section 82BB, i.e. U.S.A. system introduced in FY2007

### ৪.৪ টিআইএন রেজিস্ট্রেশন, অ্যাসেসমেন্টের এবং কর প্রদানের ক্ষেত্রে হয়রানি

'সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১০'[৭৩] অনুযায়ী, প্রায় ৬২ শতাংশ টিআইএনধারী টিআইএন রেজিস্ট্রেশন এবং কর অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। ২০১০ এর জরিপে টিআইএন রেজিস্ট্রেশন, অ্যাসেসমেন্ট এবং কর প্রদানের ক্ষেত্রে ৪১.৫ শতাংশ উত্তরদাতা শুধুমাত্র ঘুষ প্রদানের কথা বললেও ২০০৮ এর জরিপে এ হার ছিল মাত্র ২৮.১ শতাংশ। অন্যদিকে, ২০০৮ এর তুলনায় ২০১০ সালের জরিপে ৫.৫ শতাংশের বেশি উত্তরদাতা হয়রানির শিকার হওয়ার কথা বলেছেন। ২০০৮ এর করদাতা জরিপ অনুসারে, কর অ্যাসেসমেন্টের সময় রাজনৈতিক প্রভাবকে কাজে লাগানো, কোনো ভুল ঠিক করার ক্ষেত্রে হয়রানি, বিভিন্ন ফাইল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বা ঘুষ না দিলে বিভিন্ন কাগজপত্র জমা দানের নামে হয়রানির[৭৪] কথা সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগী একাধিক করদাতা উল্লেখ করেছেন ।

উল্লেখ্য যে, ২০০৮ এর জরিপে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ কোম্পানি করদাতা হয়রানি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঘুষ প্রদানের কথা বলেছেন। এছাড়াও, ব্যবসায়ীদের সাথে ২০১০ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত এফজিডিসমূহে, করদাতারা রিটার্ন ফরমে ভুল সংশোধনে ঘুষ গ্রহণ এবং পূর্বের উপ-কর কমিশনার প্রদত্ত কর ছাড়পত্র নবনিযুক্ত উপ-কর কমিশনার কর্তৃক গ্রহণ না করা, কর সংক্রান্ত চিঠি ঠিক সময়ে না পৌছানো, সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর হাতে পাওয়া, ঘুষ না দেয়ায় করদাতাকে অনুপস্থিত দেখিয়ে একতরফা কর ধার্য, উৎস করের কোন রশিদের কপি না দেয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। সার্বজনীন সেলফ অ্যাসেসমেন্ট ছাড়াও অন্য অ্যাসেসমেন্টের অনেক ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট কর ইন্সপেক্টরের সাথে পূর্বে কোন সমঝোতা না হলে সংশ্লিষ্ট করদাতার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের হুমকি দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, জরিপে (২০০৮) কর পরিদর্শক, উকিল এবং নোটিশ বিতরণকারী কর্তৃক হয়রানির শিকার হওয়ার কথা বলেছেন।

চিত্র ৮: আয়কর সেবার মান -তুলনামূলক অবস্থান

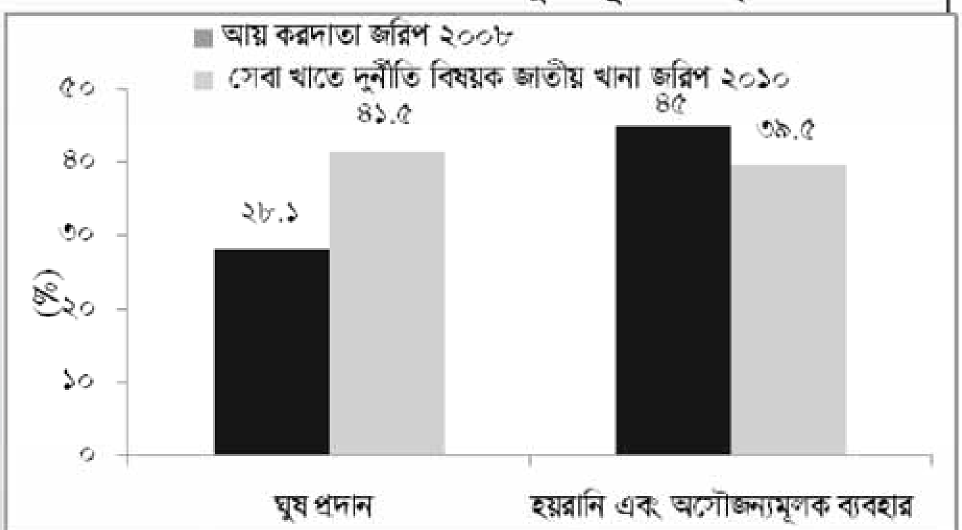


সূত্র: করদাতা জরিপ, ২০০৮ এবং সেবা খাতে দুর্নীতি বিষয়ক খানা জরিপ

একাধিক করদাতা টিআইএন সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক ঘুষ দেয়ার উল্লেখ করেছেন (এফজিডি, এপ্রিল, ২০১০)। ২০০৮ সালের করদাতা (ব্যক্তি এবং কোম্পানি উভয় ধরনের) জরিপ অনুসারে, ২৮.১ শতাংশ ব্যক্তি আয়করদাতা টিআইএন রেজিস্ট্রেশন, কর অ্যাসেসমেন্ট বা এ সংক্রান্ত কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য গড়ে ২,০০০ টাকা ঘুষ দিয়েছে, যেখানে কোম্পানি করদাতার নিকট হতে সর্বোচ্চ ৪০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঘুষ নিয়েছে (পরিশিষ্ট ৮)। ২০১০ সালের খানা জরিপে ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক কর অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে প্রদত্ত গড় ঘুষের পরিমাণ ছিল ৩,৪৭৭ টাকা।

---

৭৩ 'সেবা খাতে দুর্নীতি: একটি জাতীয় খানা জরিপ ২০১০', টিআইবি, ২০১০

৭৪ Assess the profit near to 30% and reduced expenditure near to 25%

**বক্স ১০: অ্যাসেসমেন্টে কর হয়রানি**

১০ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে 'গ' সার্কেলের কর পরিদর্শকের নিকট হইতে প্রেরিত নোটিশে করদাতা জনাব 'ফ' কে ২২ নভেম্বর ২০০৯ বেলা ১১টায় তৎকালীন অতিঃ সহকারী কর কমিশনার জনাব 'স' এর দপ্তরে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে জনাব 'ফ' ২২ নভেম্বর যথাসময়ে উপস্থিত হন, কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অফিসের বাইরে থাকায় বেলা ১.০০টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে পরদিন ২৩ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে সকল তথ্য প্রমাণ দাখিল করেন, কিন্তু সকল প্রমাণা লিখিত ভাবে গ্রহণের অনুরোধ জানালে তিনি সংশ্লিষ্ট করদাতাকে তার হেফাজতে রাখতে বলেন এবং তা প্রয়োজনে জানানোর কথা বলেন। পরবর্তীতে ১ জুন তারিখে রেজিষ্ট্রী পোষ্টকৃত একটি চিঠি ১৩ জুন ২০১০ তারিখে জনাব 'ফ' গ্রহণ করে, যা ইস্যু করা হয়েছিলো ৫ মে ২০১০ তারিখে এবং পোষ্ট করা হয়েছিলো ১লা জুন তারিখে। অথচ সেই চিঠিতে দাবীকৃত ১৪,৭১,২৪৪.০০ টাকার সর্বশেষ পরিশোধের তারিখ ছিলো ২০ মে, ২০১০। সংশ্লিষ্ট করদাতা উপস্থিত থাকলেও ৩০শে নভেম্বর ২০০৯ তারিখে সম্পাদিত চিঠির অবিকল নকলে দেখতে পান যে, ১০ই নভেম্বর ২০০৯ তারিখের নোটিশের প্রেক্ষিতে ২২শে নভেম্বর ২০০৯ তারিখে জনাব 'ফ' হাজির হয় নি। একই সাথে উল্লেখ করা হয় যে, পরবর্তী শুনানীর তারিখ ১৭ই ডিসেম্বর ২০০৯ ধার্য করা হয়েছিলো। কি ভাবে, কোন নোটিশের মাধ্যমে ১৭ই ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখ শুনানী ধার্য করা হলো তার কোন কিছুই উল্লেখ নেই। প্রশ্ন হলো, কোন আইনে শুনানির তারিখ ১৭ই ডিসেম্বর ২০০৯ইং ধার্য করে ১৭দিন আগে ৩০শে নভেম্বর ২০০৯ তারিখে রায় প্রদান করা হলো তার ব্যাখ্যা অনুপস্থিত। জনাব 'ফ'এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৪ই জুলাই ২০১০ তারিখে নোটিশ ইস্যু করা হয় যাতে শুনানী ধার্য করা হয় ১৭ই আগষ্ট, অথচ নোটিশ রেজিষ্ট্রি পোষ্ট করা হয় ১০ই আগষ্ট, যা জনাব 'ফ'এর নিকট পৌছায় ২৪শে আগষ্ট। এ প্রেক্ষিতে আপিল করা হলে, আপিল আদালত ২১ই নভেম্বর ২০১০ তারিখে পূর্ববর্তী আদেশ বহাল রেখে রায় প্রদান করে। রায়ে কৌশলে কর নির্ধারণ আদেশের তারিখ (৩০শে নভেম্বর, ২০০৯) এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন কর ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে হলে দাবীকৃত করের ৫% বা ৭৩,৫৬২ টাকা জমা দিতে হবে।

### ৪.৫ রিটার্ন জমা ও মামলা পরিচালনায় আইনজীবী'র সহায়তা

২০০৮ সালের জরিপে দেখা যায় যে, জরিপকৃত ৭৮ শতাংশ করদাতা অ্যাসেসমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণে আইনজীবীদের নিয়োগ করে, যার ৯২.২ শতাংশই ছিল কোম্পানি করদাতা (পরিশিষ্ট ৯)। করদাতাদের সাথে বিভিন্ন এফজিডি সমূহে (২০১০) আইনজীবী নিয়োগের কারণ উল্লেখ করেছেন, সে তা হলো আইনের জটিলতা, ইংরেজিতে আইনের ধারা লিখিত, কর আইন সম্বন্ধে অপ্রতুল জ্ঞান; কর অফিসের হয়রানি থেকে মুক্ত থাকার জন্য, এবং কোনো আইনজীবি বা তার সহকারীর মাধ্যমে কর অফিসে যোগাযোগ না করলে কর সংগ্রহকারীরা সহায়তা না করে উল্টো হয়রানি করে। প্রত্যেকটি আপিল মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে গড়ে ৯ মাস সময় লেগেছে বলে উল্লেখ করেছেন জরিপকৃত উত্তরদাতা (পরিশিষ্ট ১০)।

### ৪.৬ কর সংক্রান্ত সমস্যার নিষ্পত্তি

যে কোনো সংক্ষুব্ধ করদাতা উপ-কর কমিশনারের রায়ের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত বা যুগ্ম কমিশনার বা কমিশনার এবং আপিল ট্রাইবুনালের নিকট আপিল করতে পারে। ট্রাইবুনাল হল তথ্যের যথার্থতা যাচাইয়ের সর্বোচ্চ সংস্থা। জরিপের উত্তরদাতাদের মতে, ৬৮.৮ শতাংশ আপিল মামলার নিষ্পত্তি হয়েছিল এবং বাকি ৩১.২ শতাংশ অনির্দিষ্ট সময়ে অপেক্ষার জন্য মামলার নিষ্পত্তি হয় নি (পরিশিষ্ট ১১)। তবে, জরিপকৃত ৬৫.৯ শতাংশ করদাতা আপিলকৃত মামলাসমূহের রায়ে সন্তুষ্ট ছিল না।

### ৪.৭ কর রেয়াত পদ্ধতিতে চ্যালেঞ্জ

কর রেয়াতের বিধান থাকলেও বাস্তবে, কোম্পানি করদাতারা প্রদত্ত রেয়াত হাতে পায় না; পরবর্তী বছরে করের পরিমাণের সাথে সমন্বয় করা হয়। তাছাড়াও, করদাতারা কর রিফান্ড নেয়ার ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হওয়ার কথা বলেছেন (এফজিডি, ২০১০)। কর রেয়াত পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ম্যানুয়েল পদ্ধতি অনেক বেশি ঝামেলাপূর্ণ এবং হয়রানিমূলক।

### ৪.৮ করদাতাদের সচেতনতা

যদিও স্থানীয় কর অঞ্চলের অফিসে এবং এনবিআরের ওয়েবসাইটে কর সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, ফরম, যেমন রিটার্ন ফরম, আইনসমূহ, রিটার্ন ফরম নির্দেশিকা এবং কর ক্যালকুলেটর পাওয়া যায়, কিন্তু এগুলো সম্বন্ধে অনেক করদাতা বা নাগরিকগণ সচেতন নয়। তাছাড়াও, এনবিআর বিদ্যমান বা ভবিষ্যৎ করদাতাদের এ বিষয়ে কোনো ওরিয়েন্টেশন প্রদান করে না বলে জানিয়েছেন এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী ব্যবসায়ীবৃন্দ। অধিকন্তু, ২০০৮ সালের করদাতা জরিপে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, রিটার্ন ফরমের জন্য নির্ধারিত কোন চার্জ আছে কি না। প্রায় ২১.২ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন যে, তারা সে সম্বন্ধে অবগত নয়। প্রায় ২৫ শতাংশ উত্তরদাতা করমুক্ত আয় সীমা সম্বন্ধে (পরিশিষ্ট ১২)। ১৪ শতাংশ জানেন যে, কর না দেয়া একটি শাস্তিমূলক অপরাধ[৭৫]।

আয়কর বিভাগের সার্বিক স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা করদাতাদের প্রদত্ত সেবার মানের ওপর নির্ভর করে। যেহেতু ভবিষ্যতে আয়কর সংগ্রহকে কর রাজস্বের প্রধান ভিত্তি করতে হবে তাই সব ধরনের অনিয়ম এবং যথেচ্ছার বন্ধ করে বিদ্যমান এবং ভবিষ্যৎ করদাতাদের হয়রানি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থার বিকল্প নেই। সব ধরনের দুর্নীতি বন্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতির প্রয়োগ করতে হবে।

৭৫ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪, (সেকশন ১১ডি)

# শুল্ক বিভাগঃ চ্যালেঞ্জসমূহ

আমদানি পর্যায়ের সব ধরনের শুল্ক ও কর সংগ্রহের প্রধান দায়িত্ব শুল্ক বিভাগের। এই বিভাগের আরো দায়িত্ব হল বাণিজ্য সহযোগিতা, সরকারি আইনের বাস্তবায়ন, সমাজ ও পরিবেশ সুরক্ষা, বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিসংখ্যান তৈরি, বাণিজ্যের নিশ্চয়তা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে সহায়তা[৭৬]। ১৮৭৮ সালে শুল্ক আইন ব্রিটিশ ভারতে প্রথম চালু হয় এবং তখন থেকেই শুল্ক হচ্ছে রাজস্ব আয়ের প্রধান মাধ্যম।

### শুল্ক বিভাগের গঠন এবং কার্যক্রম

এনবিআর এর কর্মকাণ্ডের অন্যতম শাখা শুল্ক বিভাগ, যা তিনটি শাখার সমন্বয়ে গঠিত- ১) কাস্টমস হাউজ, ২) এক্সাইজ এবং শুল্ক, ৩) গোয়েন্দা সেল। এখানে প্রায় ১১০ টি শুল্ক পয়েন্ট আছে।[৭৭] এগুলো পরিচালিত হয় কমিশনারের মাধ্যমে, অতিরিক্ত আপীলেট কমিশনার ঢাকায় কাজ করেন। গোয়েন্দা সেল প্রতারণা, কর ফাঁকি, চোরাচালান, সংক্রান্ত মামলা এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত পণ্য আগমনের মামলা অনুসন্ধান করে। এটা বিদেশী মুদ্রার বিনিময়, অস্ত্র এবং মাদকের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে। গোয়েন্দা শাখা শুল্ক মূল্যায়ন, অডিট এবং মাঝে মাঝে, শুল্ক অফিসারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। শুল্ক বিভাগের প্রধান কার্যাবলীগুলো হল, ১) চোরাচালান প্রতিরোধ, ২) বাণিজ্যিক প্রতারণা প্রতিরোধ, ৩) শুল্ক সংক্রান্ত অভিযোগগুলোর মীমাংসা করা, ৪) নিরাপত্তা বিধান, ৫) মাদক ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, এবং ৬) বিদেশি বিনিময় নিয়ন্ত্রণ।

**রেখা চিত্র ৯: এনবিআরের কর রাজস্ব সংগ্রহে আমদানি পর্যায়ে করের অবদান (%)**

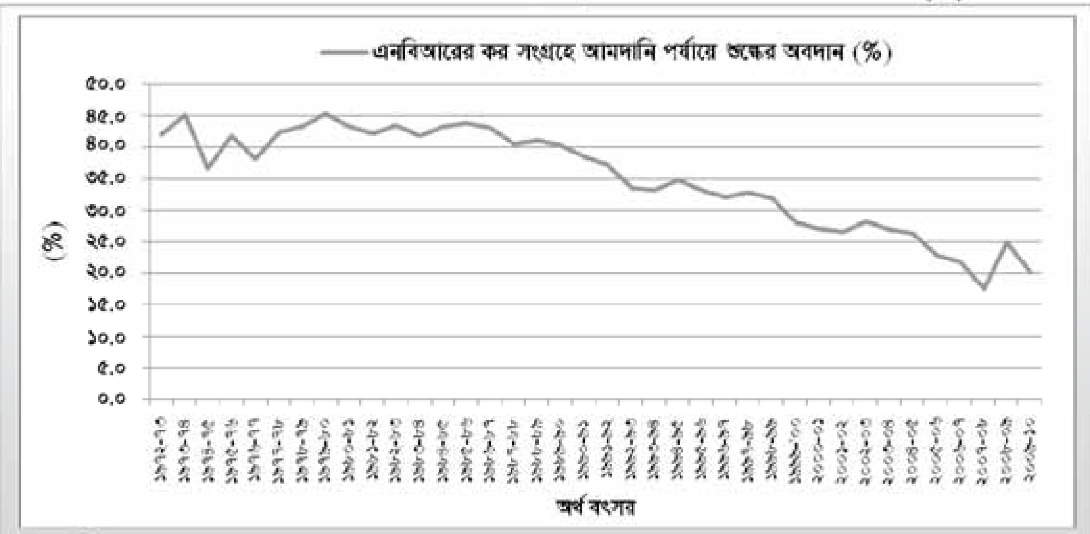


সূত্রঃ এনবিআর, ২০১০

এনবিআরের কর আদায়ে শুল্ক করের অবদান ক্রমান্বয়ে কমছে। ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে এর অবদান ৪২.১% হতে কমে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে তা ১৭.১% এ দাড়িয়েছে। এমটিবিএফ প্রতিবেদনে পরবর্তী ২০১১-১২ অর্থ বছরে তা ১৫.৯% এ দাঁড়াবে বলে উল্লেখ রয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এবং অন্যান্য দ্বৈত ও বহুপাক্ষিক চুক্তির কারণে সরকার ইতোমধ্যে শুল্ক হার কমিয়েছে। ফলে, আমদানি করের অবদান দিন দিন কমছে।[৭৮] সর্বোপরি সার্বিকভাবে প্রত্যক্ষ কর এবং মূসকের মাধ্যমে রাজস্ব বৃদ্ধির ওপর নির্ভরতা বাড়বে। প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন প্রায় ১২ ধরনের পণ্য শুল্কমুক্ত[৭৯]।

---

[৭৬] http://www.nbr-bd.org/customs.html

[৭৭] প্রধান কাস্টমস পয়েন্টগুলো হলো, ক) সী পোর্টঃ চট্টগ্রাম এবং মংলা; খ) বীমানবন্দরঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট; গ) স্থল বন্দরঃ বেনাপোল, টেকনাফ, বাংলাবান্দা, সোনামসজিদ, হিলি, দর্শনা, বিরল, বুড়িমারী, তামাবিল, হালুয়াঘাট, আখাউরা, বিবিরবাজার, ভোমরা।

[৭৮] http://www.nbr-bd.org/statistics/data_as_on_280509.pdf

[৭৯] Capital machinery; Chemicals of leather and leather goods; Defense stores; Goods for blind and physically retarded people; and Import by Embassy and UN; Poultry Medicine, Feed & machinery; Private power generation unit; Raw materials of Medicine; Relief goods; Solar power equipment; and Textile raw materials and machinery

এ প্রেক্ষাপটে এনবিআর ইতোমধ্যে বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপ নিয়েছে,[৮০] তারপরও শুল্ক বিভাগের সেবার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ নিম্নে বর্ণণা করা হলো-

### ৫.১ শুল্ক অবকাঠামোর চ্যালেঞ্জসমূহ

- অ্যাসেসমেন্ট এবং ভ্যালুয়েশন এর কাজে অদক্ষ কর্মীরা নিয়োজিত ভ্যালুয়েশন বিশেষজ্ঞের অভাব;
- বিভিন্ন ব্র্যান্ডের পণ্যের আমদানি মূল্যের পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব;
- দুর্নীতি দূর করতে কর আদায়কারী কর্মীর জোরালো প্রতিশ্রুতির অভাব; এবং
- স্থলবন্দরে অপ্রতুল অবকাঠামো।

### ৫.২ শুল্কায়নে সার্বিক চ্যালেঞ্জসমূহ

শুল্ক বিভাগের অনিয়ম সরকারের রাজস্ব আয় কমিয়ে দেয়, বাণিজ্য নীতির ভিত্তি, যা ট্যারিফ কাঠামোতে ব্যবহৃত, দুর্বল হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিম্ন ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। নতুন আমদানিকারক ও নৈতিক মানসম্পন্ন ব্যবসায়ীরা এ ধরনের ব্যবসায়িক পরিবেশে ব্যবসায় টিকে থাকতে পারে না। দুর্নীতি বা ঘুষের মাধ্যমে আমদানিকারকরা কম করের মাধ্যমে পণ্যের দ্রুত অ্যাসেসমেন্ট এবং ছাড় করতে হয়। জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করায় ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক ঘুষ আদায় এবং ব্ল্যাকমেইল করে থাকে। চলমান দুর্নীতি বন্ধ না করলে চোরাকারবারি, আমদানী পর্যায়ে শুল্ক আত্মসাৎ/ফাঁকি, অবিশুদ্ধ এবং অস্বাস্থ্যকর পণ্য আমদানি বন্ধ করা যাবে না। সার্বিকভাবে শুল্কায়ন ও কর রেয়াতে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে নিম্নের সীমাবদ্ধতা এবং অনিময়গুলো বিদ্যমান।

**সারণি ৫: শুল্কায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ**

| কার্যক্রম | সমস্যা, অনিয়ম ও প্রতিবন্ধকতা |
|---|---|
| শুল্ক প্রশাসন | • শুল্ক ফাঁকি, দ্রুত শুল্কায়নের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতি<br>• আমদানিকারক/ সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট ও কর স্টাফের মধ্যে অবৈধ যোগসাজশ |
| অ্যাসেসমেন্ট এবং মূল্য নির্ধারণ | • অ্যাসেসকৃত মূল্যে'র অন্তর্ভুক্ত একাধিক মূল্য সম্পর্কে আমদানিকারকের নিকট তথ্য না থাকায় rent seeking এর সুযোগ<br>• কার্গোর ধরন, সংখ্যা ও কান্ট্রি অব অরিজিন সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রদান/গোপন করা<br>• আন্ডার ইনভয়েসের জন্য কর স্টাফ কর্তৃক ঘুষ গ্রহণ<br>• ভুয়া এইচএস কোড, নিম্ন ওজন ও মিথ্যা পণ্য ঘোষণাকে অবৈধ অর্থের বিনিময়ে চ্যালেঞ্জ না করা<br>• আমদানিকৃত পণ্যের পরিচয়, ধরন, শ্রেণী, মূল্য এবং মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় কর নির্ধারণকারীর জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে ত্রুটিপূর্ণ এবং ভুল মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া |
| প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন | • অবৈধ অর্থের বিনিময়ে পণ্যের বিষয়ে ও পরিমাণে ভুল তথ্য প্রদানে আমদানিকারককে অনুমতি প্রদান<br>• আন্ডার/ওভার ইনভয়েস, ভুল এইচএস কোড এবং পণ্যের নিম্ন দাম উল্লেখ করা<br>• ভুল পরির্দশন এবং ঘুষের বিনিময়ে আমদানিকারককে ত্রুটিপূর্ণ রিপোর্ট প্রদান<br>• অবসরপ্রাপ্ত এনবিআর এর কর্মকর্তাদের বেশি বেতনে নিয়োগ দিয়ে এনবিআর এ প্রভাব বিস্তার<br>• যথার্থভাবে অডিট না করা<br>• মুদ্রা-পাচারে সহায়তা দান |
| পণ্যের কায়িক/ বাহ্যিক পরীক্ষণ | • ভুয়া COO, CRF চালান/সার্টিফিকেটের অনুমতি প্রদানের জন্য ঘুষ নেওয়া<br>• ঘুষের বিনিময়ে পূর্বে নির্বাচিত ইন্সপেক্টর দ্বারা কায়িক পরীক্ষা<br>• ওভার ইনভয়েস বা নতুন নামে পুরাতন যন্ত্রপাতি আমদানির অভিযোগ |
| বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধা; কর রেয়াত | • প্রকৃত রপ্তানিকারককে বন্ডেড সুবিধা এবং কর প্রত্যর্পণ সুবিধা প্রদান না দেওয়া<br>• বন্ডেড ওয়্যারহাউজ ব্যবহারে আগ্রহী রপ্তানিকারকদের সুযোগ না দেওয়া<br>• পর্যাপ্ত কাগজপত্র ছাড়া বন্ডেড পণ্যসমূহের ছাড় বা গোপনে অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্য বিক্রির অনুমতি দেওয়া; কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর কর্মকর্তার যোগসাজশে অতিরিক্ত কর প্রত্যর্পণ দাবি |

[৮০] Installation of locally invented and managed full automation scheme, Modernization of Dhaka and Benapole customs house is underway; Merging Chittagong Customs House and Export Wing; Commisionarate will be established in Chittagong; Dhaka ICD as a full Customs House; Convert 9 customs points as Div. Office; Set up new customs Bhaban in Munshiganj and Rajshahi; Creation of the customs related post in 10 Bangladeshi embassies.

## ৫.৩ উচ্চ মূল্য নির্ধারণ

করমুক্ত আমদানি বিশেষ করে বস্ত্র শিল্পের প্রয়োজনীয় করমুক্ত কাঁচামাল আমদানি প্রক্রিয়াজাত করার জন্য শুল্ক এজেন্টকে অবৈধ অর্থ প্রদান করতে হয়। এমনকি পিএসআই এজেন্সির উপস্থিতিতে ম্যানুফেকচারার দ্বারা বন্ডেড ওয়ারহাউজ হতে বিনা বাধায় অবৈধ কাঁচামাল বিক্রি হয়। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, ফেব্রিকস আমদানির ক্ষেত্রে প্রদত্ত বিশেষ কর সুবিধার অপব্যবহার কমাতে বিজিএমইএ নিজস্ব আইনি পদক্ষেপ নিয়েছে।

## ৫.৪ নিয়ন্ত্রণহীন পিএসআই এবং কর ফাঁকি

শুল্ক বিভাগে দুর্নীতি কমানোর জন্য বিশেষত: পণ্য স্থানান্তর এবং বিশ্বাসযোগ্য ভ্যালুয়েশনের জন্য ২০০০ সালের জুন মাসে পিএসআই পদ্ধতি চালু হয়। পণ্য আমদানি/রপ্তানির সময়কালে বা পূর্বে পিএসআই এজেন্সি দ্বারা পণ্যের ইন্সপেকশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বর্তমানে ৪টি পিএসআই কোম্পানি বিদ্যমান এবং এই পদ্ধতি ২০১১ এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। অর্থমন্ত্রী নতুন পিএসআই কোম্পানি নিয়োগের প্রস্তাব করার পর মন্ত্রণালয় এবং এনবিআর এর মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা লক্ষ্য করা গেছে। প্রায় ৬০% এর ওপর শিপমেন্ট পিএসআই নীতিমালার আওতায় পড়েছে, ব্যতিক্রম শুধু সরকারি প্রকল্প এবং ডিপ্লোমেটিক পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে। পিএসআই ব্যবস্থা পণ্যের ক্লিয়ারেন্সের ক্ষেত্রে ঘুষ কমাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি (দেখুন বক্স ১১)। উল্লেখ্য, ২০০৮ সনের ১৯ মার্চ ৫৫০ টি আমদানি অর্ডারে অনিয়ম ও দুর্নীতির জন্য পিএসআই কোম্পানি কোটেকনা ইন্সপেকশন এসএএ কোম্পানির লাইসেন্স বাতিল করা হয়, এমনকি হ্যামার ৩ গাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে ৩৫,২১৫ ইউএস ডলারের পরিবর্তে ১৮,৫০০ ডলার দেখিয়ে কর ফাঁকিতে সহায়তা করে[৮১]।

**বক্স ১১: ভুয়া পরিদর্শন এবং রাজস্ব ক্ষতি**

পণ্যের আন্ডার ইনভয়েসিং এবং ওভার ইনভয়েসিং এর নামে শুল্ক বিভাগে দুর্নীতি একটি সাধারণ জালিয়াতিতে পরিণত হয়েছে। এনবিআর জেনারেল মোটরস এর ওয়েবসাইট সন্ধান করে দুটি পিএসআই কোম্পানী আইটিএস এবং এসজিএস কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য এবং প্রকৃত মূল্য জানার চেষ্টা করলেও 'প্রোব কমিটি' চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজকে আমদানিকারক কোম্পানী 'এএম' এর নিকট হতে আত্মসাৎকৃত কর আদায় এবং ভুয়া ডিকারেশনের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়। যতদূর জানা যায়, ১৫টি আমদানীকৃত হামার কারের মধ্যে ৮টির কর প্রদান করা হয় নি এবং এতে সরকারের প্রায় ২১১ কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়। উল্লেখ্য, অষ্টম সংসদের আইনপ্রণেতাদের মাধ্যমে প্রায় ৩০৩টি উচ্চ মূল্যের করমুক্ত গাড়ি আমদানি করা হয়েছিলো। রোলস রয়েস, মার্সিডিস বেঞ্জ, স্পর্শকাতর ফটোকপি মেশিন, কন্ট্রাবেন্ড সিগারেটস, ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য,করমুক্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল যন্ত্রপাতি এবং ভুয়া ডিক্লারেশন ও মূল্য ম্যানিপুলেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশে কিনা আমদানি হয়। (সূত্র: ডেইলি স্টার, ২৬ মে, ২০০৮)

আমদানিকারকরা মূল্য এবং গুণাগুণ যাচাই না করেই ভুল অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট প্রদানের ন্যায় সমস্যা মোকাবেলা করে। প্রথমে পিএসআই দ্বারা মূল্য বৃদ্ধি করা হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে শুল্ক কর্মকর্তারা সমস্যার সম্মুখীন হয়। অনেক ক্ষেত্রে শুল্ক কর্মকর্তা পিএসআই নির্ধারিত পণ্যের ধরনকে গ্রহণ করে না বলে এফজিডিতে উল্লেখ করেছেন (এফজিডি, ২০১০)। ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ মনে করছেন যে, পিএসআই পদ্ধতি বাতিল হলে আমদানির পরিমাণ বাড়বে।

### পিএসআই অডিট সিস্টেম

পিএসআই বিধি (৫/২) অনুসারে, নিজেদের নিরীক্ষার কথা থাকলেও তারা তা করে না, তারা নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান (Audit Farm) কর্তৃক মাসিক স্ক্রিনিং এড়িয়ে যায়। তথাপি, এনবিআর পিএসআই অডিটের জন্য নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পিএসআই কোম্পানিগুলো অবসরপ্রাপ্ত এনবিআর স্টাফকে উচ্চ বেতনে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগের মাধ্যমে প্রশাসনে প্রভাব বিস্তার করে।

## ৫.৫ ইন্সপেকশান এবং আন্ডার ইনভয়েসিং

পূর্বে, কায়িক পরীক্ষার (ফিজিক্যাল ইন্সপেকশন) জন্য দু'টো দল নিযুক্ত ছিল, কিন্তু বর্তমানে ৭টি দল কাজ করছে। স্বাভাবিকভাবে, ঘুষের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়ে ৫ গুণ হয়েছে (এফজিডি ২০১০)। যেহেতু ভ্যালুয়েশনের জন্য বাণিজ্যিক ইনভয়েস প্রধান দলিল আমদানিকারক, রপ্তানিকারক এবং শুল্ক এজেন্ট ইনভয়েসে লিখিত পরিমাণ পরিবর্তন করে পছন্দানুযায়ী নিম্ন মূল্য লিখে দেয় এবং শুল্ক কর আত্মসাৎ করে।

---

[৮১] দ্য ডেইলি স্টার, ২৯ এপ্রিল ২০০৮

**বক্স ১২: ইলেক্ট্রনিক ম্যানুফেকচার কর্তৃক শুল্ক কর ফাঁকি**

একটি নামকরা ইলেকট্রনিক ম্যানুফেকচারার কোম্পানী চিহ্নিত হয়েছে, যারা পিএসআই কোম্পানি 'এক্স', সি এন্ড এফ এজেন্ট এবং কর সংগ্রহকারীর যোগসাজশে ২০০২-০৩ থেকে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে প্রায় ১৮০ কোটি কর ফাঁকি দিয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে পরিলক্ষিত হয়েছে। এই কোম্পানী প্রতি মাসে ৩৫-৪০টি কন্টেইনার দ্বারা ১২/১৫টি বিল অব এন্ট্রির মাধ্যমে ১.২৫ মিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করলেও মূল্য দেখায় ০.৮৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার। প্রতিটি পণ্যের প্রকৃত মূল্য ৩০-৪০ হাজার ইউএস ডলার কিন্তু কর ফাঁকির দেয়ার জন্য প্রতিটির দাম ২২-২৫ হাজার ইউএস ডলার দাঁড়ায়। সংশ্লিষ্ট কোম্পানী নকল ইনভয়েস প্রদান করে যা প্রকৃত মূল্যের অর্ধেক মূল্য দেখায় এবং এসব অনিয়মের কাজে পিএসআই কোম্পানী সহায়তা করে। এ পদ্ধতিতে পিএসআই কোম্পানী, সিএন্ডএফএজেন্ট এবং শুল্ক অফিসারদের সহায়তায় বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক পণ্য সামগ্রী আমদানি করার ক্ষেত্রে কর ফাঁকি দিয়ে থাকে। (সূত্র: আইসিডি, ডিসেম্বর ২০০৭)

### ৫.৬ শুল্কায়ন প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞতা

অ্যাসেসমেন্টের সময়, আমদানি করা পণ্যের ধরন ও সংখ্যা সম্পর্কে জরিপকৃত ১৮.৭% সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট প্রদত্ত ভুল তথ্য গ্রহণ করা এবং শুল্ক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ভিতর ২৮.১% ভুল কান্ট্রি অব অরিজিন উল্লেখ করা এবং ৩৬.৩% এইচএস কোডের ভুল ব্যাখ্যার জন্য ঘুষ প্রদান করে থাকে। করমুক্ত আমদানি বিশেষ করে বস্ত্র শিল্পের প্রয়োজনীয় করমুক্ত কাঁচামাল আমদানি প্রক্রিয়াজাত করার জন্য শুল্ক এজেন্টকে অবৈধ অর্থ প্রদান করতে হয়। এমনকি পিএসআই এজেন্সির উপস্থিতিতে ম্যানুফেকচারার দ্বারা বন্ডেড ওয়ারহাউজ থেকে বিনা বাধায় অবৈধ কাঁচামাল বিক্রি হয়। উল্লেখ্য, ৫৮৩টি আমদানিকৃত কনসাইনমেন্টের মধ্যে ৭২% পণ্য ছাড়ের ক্ষেত্রে ঘুষ দিতে হয় এবং কনসাইনমেন্ট প্রতি গড়ে ২,৩৪৫ টাকা ঘুষ দিতে হয় এবং ঢাকা আইসিডিতে সর্বাধিক ঘুষের পরিমাণ ৫,২০০ টাকা (পরিশিষ্ট ১৩) এবং প্রায় ১৭ ধরনের কাজে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে[৮২]। উল্লেখ্য, হয়রানির প্রকৃতির ক্ষেত্রে যেসব বিষয় উল্লেখ করেন সেগুলো হল, ফাইল ডেলিভারিতে সমস্যা, দুর্ব্যবহার, বিভিন্ন ডকুমেন্ট ও ফর্ম সাবমিট করা জন্য চাপ উল্লেখযোগ্য (পরিশিষ্ট ১৫)। শুল্কায়নের বিভিন্ন ধাপে গড়ে ১-৩ দিন সময় লেগেছে[৮৩]।

### ৫.৭ কায়িক (Physical) পরীক্ষায় সততা

জরিপ (২০০৮) অনুযায়ী, ৪৪.১% সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট কায়িক পরীক্ষার সময় ঘুষ প্রদানের শিকার হয়েছেন প্রায় ২৯% ঘুষের বিনিময়ে পূর্ব নির্ধারিত ইন্সপেক্টরের মাধ্যমে কায়িক পরীক্ষা করিয়েছিলেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কায়িক পরীক্ষা করা হয়নি এবং পরীক্ষার পর প্রদত্ত প্রতিবেদনেও পরিবর্তন এনেছিল।

### ৫.৮ শুল্ক কর্মকর্তাদের দুর্বল জবাবদিহিতা এবং অস্বচ্ছতা

শুল্কায়নের ন্যায় প্রায়-আইনি (quasi-legal) কার্যক্রম সময়-সীমা দ্বারা আবদ্ধ নয় সেজন্য শুল্ক কর্মকর্তাবৃন্দ অনেক ভাবে একচ্ছত্র ক্ষমতা ভোগ করে, যার ফলে ঘুষের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। যদি দাবিকৃত অবৈধ অর্থ প্রদান না করা হয় বা উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রভাব না খাটানো হয়, তবে শুল্কায়নে অনির্দিষ্ট সময় দেরি হয়। এমনকি আদেশ দেয়া সত্ত্বেও অবৈধ অর্থের লেনদেন না হওয়া পর্যন্ত পণ্য না ছাড়ার একাধিক অভিযোগ পাওয়া গেছে। অধিকন্তু, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাস্টমস ইন্সপেক্টররা শিপমেন্টের একটা অংশ কোন কারণ ছাড়াই 'উপহার সামগ্রী' হিসেবে গ্রহণ করে থাকে (এফজিডি ২০১০)। এডজুডিকেটর উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয় এবং কোন স্বচ্ছতা ছাড়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। অ্যাসেসমেন্টের কাজে এবং আমদানি শুল্ক আদায়ে নিয়োজিত শুল্ক কর্মকর্তারা আমদানিকারকদের নিকট থেকে বিভিন্নভাবে যেমন, বিলম্ব, ভুল মূল্যায়ন, ভুল শ্রেণীবদ্ধকরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক ঘুষ আদায় করে (এফজিডি এবং জরিপ ২০০৮)।

### ৫.৯ সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট: দুর্নীতি সংঘটনের সহযোগী

আমদানীকারকদের পক্ষে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টরা কর স্টাফদের হয়রানির ভয় দেখিয়ে আমদানীকারকদের নিকট থেকে অধিক চার্জ আদায় করে থাকে। অনেক সময় জ্ঞানের স্বল্পতাহেতু আইনি বিষয়ে কর সংগ্রহকারীদের ওপর অধিক নির্ভরশীলতার কারণে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টদের ভুল হয়, এক্ষেত্রে আমদানিকারকরা তার ফলাফল ভোগ করে।

[৮২] পরিশিষ্ট ১৪
[৮৩] পরিশিষ্ট ১৬

### ৫.১০ কর মওকুফ এবং প্রত্যার্পণ অফিসে দুর্নীতি

কর প্রত্যার্পণ[৮৪] এমন একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে একজন রপ্তানিকারক তার রপ্তানিকৃত দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত কর এবং শুল্ক প্রত্যার্পন হিসেবে পেয়ে থাকে[৮৫]। রপ্তানি কর প্রত্যার্পণ সহজে প্রাপ্তির জন্য ১৯৮৭ সনে কর মওকুফ এবং প্রত্যার্পন অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে, কর প্রত্যার্পণ পেতে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেরি, হয়রানি, ঘুষ, প্রতারণা এবং জালিয়াতির কথা উল্লেখ করেছেন এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী ব্যবসায়ীরা (এফজিডি, ২০১০)। রপ্তানির কর প্রত্যার্পনের ক্ষেত্রে যে ধরনের হয়রানি ও অনিয়মের সম্মুখীন হয়েছিল সেগুলো হল:

- কর প্রত্যার্পণ পরিমাণ হিসাব করার ক্ষেত্রে উপকরণ মূল্যের (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) ঘন ঘন পরিবর্তন বিবেচনায় বিলম্ব করা;
- কর মওকুফ এবং কর প্রত্যার্পণ অফিস এবং মূসক কর্তৃপক্ষের মধ্যে কাজ নির্দিষ্টকরণে সমস্যা;
- রপ্তানিকারক কর্তৃক দলিলসমূহ জমা দানের ক্ষেত্রে ভুয়া ও অবৈধ পাস বুক প্রদান;
- অনেক দলিল/কাগজপত্র প্রদানের জন্য স্বল্প সময় প্রদান;
- কাগজপত্র পরীক্ষায় বিলম্ব এবং অনির্দিষ্ট ও অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে চেক ভাউচার রিফান্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব।

চিত্র ১০: কর প্রত্যার্পণ সেবায় অভিজ্ঞতা

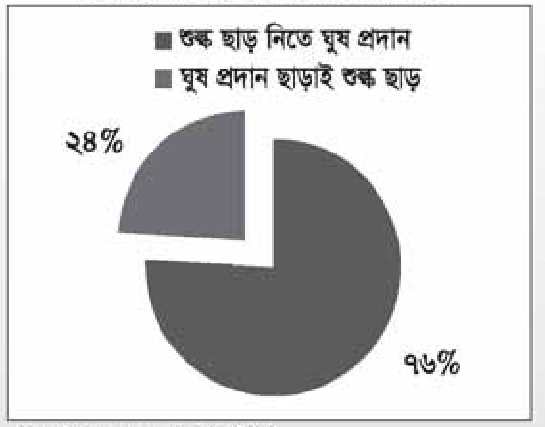


সূত্র: সি এন্ড এফ এজেন্ট জরিপ

অন্যান্য দেশের রপ্তানিকারক এবং দেশীয় ওয়ারহাউজ ব্যবহারকারী রপ্তানিকারকরা অতিরিক্ত মূল্য এবং ঝামেলা থেকে মুক্ত। অটোমেশনের পর ভুয়া ও অনিয়মের ঘটনা হ্রাস এবং কোনোরকম ঝামেলা ব্যতীত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর রেয়াত পাওয়া সম্ভব হবে।

**ব্যবসা শুরুর ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা**

জরিপকৃতরা 'তৈরি পোষাক শিল্প প্রস্তুতকারী (২০১০)' জানিয়েছেন যে, ব্যবসা শুরুর ক্ষেত্রে টিআইএন সার্টিফিকেট, মূসক রেজিস্ট্রেশন, কাস্টমস বন্ড লাইসেন্স গ্রহণের ব্যবসার ধরন এবং আকার অনুযায়ী ১০০ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঘুষ প্রদান করেছে; বন্ড লাইসেন্স অথবা সার্টিফিকেট পেতে প্রায় ১ বছর অপেক্ষা এবং মূসক রেজিস্ট্রেশনের জন্য ৯০ দিনের বেশি সময় লাগার কথা বলেছেন। অটোমেশনের পর অনিয়মের ঘটনা হ্রাস এবং ঝামেলা ব্যতীত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর প্রত্যার্পণ পাওয়া সম্ভব হবে।

---

৮৪ Foreign Exchange Regulation Act, 1947

৮৫ রাজস্ব সংস্কার কমিশন রিপোর্ট ২০০৩, পৃ. ২৯৫

## ষষ্ঠ অধ্যায়
# মূল্য সংযোজন করঃ চ্যালেঞ্জসমূহ

মূসক গতানুগতিক বিক্রয় কর অপেক্ষা ভিন্ন। উৎপাদন এবং বিতরণের প্রতি ক্ষেত্রেই পণ্যের শতকরা হারে মূল্য সংযোজিত করা হয়। মোট মজুরি, বিভিন্ন পরিচালনা ব্যয়, লাভ বা উৎপাদ দামের সর্বমোট বিক্রয় করের সমষ্টি হতে উপকরণ ব্যয় বাদ দিলে তা হল মূসক। বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে নানা প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও বিক্রয় করকে প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে মূসক চালু করা হয়।[৮৬] বাংলাদেশে ১৯৭৯ সালের এপ্রিলে কর ইনকোয়েরি কমিশন (Tax Inquiry Commission-TEC) মূসক প্রচলনের সুপারিশ প্রদান করে। পরবর্তীতে, বাংলাদেশে অন্তঃশুল্ক, বিক্রয় কর এবং ব্যবসা টার্নওভার কর এর পরিবর্তে ১৯৯১ সালের ১ জুলাই থেকে মূসক চালু হয়েছে। এনবিআর রাজস্ব সংগ্রহে মূসকের অবদান বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৩৭.৩৬% এ দাঁড়িয়েছে।

এনবিআরের সার্বিক কর রাজস্বের ভবিষ্যৎ প্রাক্কলন উর্ধ্বমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে। বর্তমানে সার্বিক কর রাজস্বের এক তৃতীয়াংশের বেশি মূসক হতে আসে। নিবন্ধীকৃত মূসক সংগ্রহে অথবা ভোক্তাদের নিকট হতে ব্যবসায়ীরা মূসক সংগ্রহ করে এবং সরকারি কোষাগারে তা জমা দেয়।

রেখা চিত্র ১১: এনবিআরের কর রাজস্ব সংগ্রহে মূসকের অবদান (%)

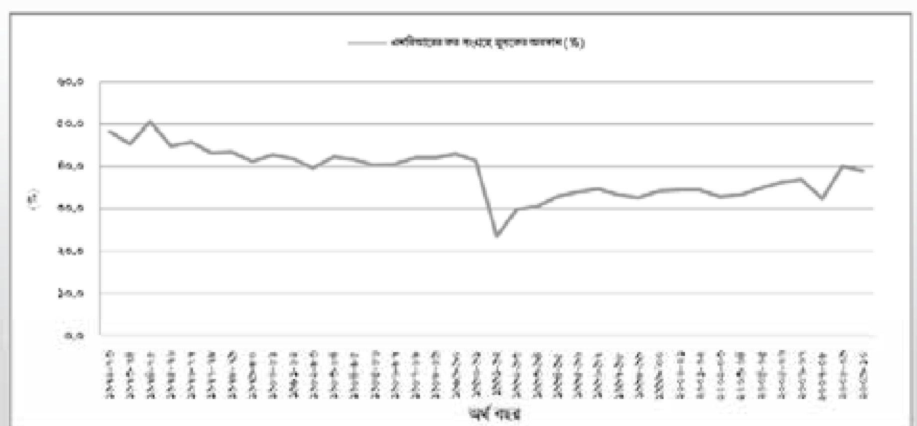


সূত্রঃ এনবিআর, ২০১০

### ৬.১ মূসক প্রশাসনের কার্যাবলি

৬ জন কমিশনার পর্যায়ের কর্মকর্তার সমন্বয়ে মূসক সংগ্রহ করা হয়ে থাকে, যাদের দুজন ঢাকায় এবং একজন করে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, যশোর এবং খুলনায় কর্মরত। বিভিন্ন সার্কেলের এবং বিভাগীয় অফিসাররা প্রধানত মূসক প্রশাসন পরিচালনা করে। মাঠ পর্যায়ের অফিসার ও কর্মীদের কাজ এবং দায়িত্ব নিম্নে আলোচনা করা হল:[৮৭]

### সার্কেল অফিস (সিও)

সার্কেল অফিস মূসক প্রদানকারী নির্ধারণ, ডকুমেন্ট জমা এবং মূসক রেজিস্ট্রেশনে সূচনা কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। প্রত্যেক সার্কেল অফিসে, একজন সুপারিটেনডেন্টের অধীনে ৬/৭ জন ইন্সপেক্টর হিসেবে তাদের কাজের জবাবদিহিতা করে থাকে। তারা মূসক নীতি বাস্তবায়ন, রাজস্ব সংগ্রহ এবং মূসক রিটার্ন পরীক্ষা করে। সার্কেল অফিসে সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করে। তার কার্যাবলী নিম্নরূপঃ ১. ইন্সপেক্টদের ও অন্যান্যদের প্রতিদিনের কাজ তত্ত্বাবধান করা, ২. করদাতা, বিভাগীয় এবং কমিশনারদের অফিসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা, ৩. যেকোনো সার্কেলের কর ফাকির অভিযোগ এবং অনিয়ম চিহ্নিতকরণ।

---

[৮৬] Sharma, C. Kumar 2005, Implementing VAT in India: Implications for Federal Polity, Indian Journal of Political Science, LXVI (4): 915-934. [ISSN: 00019-5510]

[৮৭] As of NBR's Order, 12/VAT/99/184 dated at 10/06/99

**বিভাগীয় অফিস (ডিও)**

সার্কেল অফিস নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করা বিভাগীয় অফিসের সহকারি অথবা উপ কর কমিশনারের দায়িত্ব। একটি ডিও'র ৪টি কাজ: ১. তথ্যদাতাদের তালিকা সংরক্ষণ, নতুন প্রতিষ্ঠান তালিকাবদ্ধকরণ, রিটার্ন অ্যাসেসমেন্ট/পরীক্ষা করার জন্য তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট; ২. নাম, ঠিকানা, মূসক প্রদানের জন্য ব্যবসার ধরণের তালিকা সংরক্ষণ এবং টার্নওভার কর এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য এনফোর্সমেন্ট ইউনিট; ৩. মূসক কার্যক্রম এবং তাদের রিপোর্টিং প্রক্রিয়া বিষয়ক অডিট ইউনিট; এবং ৪. আবেদনের জন্য নিবন্ধন প্রক্রিয়া এবং নিবন্ধনের লক্ষ্যে করদাতা তথ্য এবং সেবা ইউনিট। এনবিআর কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে-

- অনলাইন মূসক নিবন্ধন এবং রিটার্ন জমা চালু;
- অধিক মূসক অফিসার নিয়োগে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রত্যেক উপজেলায় ক্ষুদ্র মূসক অফিস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ;
- ইনভয়েস (মূসক - ১১) দাখিল করার জন্য ৭২ ঘন্টা থেকে ৩ কর্ম এলাকার মধ্যে নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ;
- মূসক সম্পর্কিত চলমান মামলাগুলোর সময়সীমা ১ বছর থেকে ৯ মাসে কমিয়ে আনা;
- মূসক আইনে কর আত্মসাৎ বা ফাঁকির ক্ষেত্রে আত্মসাৎকৃত মূসকের সমান বা দেড়গুণ গুণ পর্যন্ত জরিমানা;
- সংশ্লিষ্ট অনিয়মের ঘটনা, জরিমানা এবং শাস্তি হ্রাসপূর্বক ১০,০০০ টাকার পরিবর্তে ৫,০০০ টাকায় এবং লঘু অপরাধের জন্য জরিমানা ২৫,০০০ টাকার পরিবর্তে ২০,০০০ টাকা করা;
- তালিকাভুক্ত বৃহৎ ও মধ্যম ব্যবসার জন্য ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার (ইসিআর) ২০০৯ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে চালু করা; এবং
- মূসক এবং আয়কর বিভাগকে একীভূত করা[৮৮]।

## ৬.২ মূসক ক্যালকুলেশন

মূসক ক্যালকুলেশনের ভিত্তিসমূহ হল নিম্নরূপ-

**সারণি ৬: মূসক হিসাবের ভিত্তি**

| স্তরসমূহ | | মূসকের ভিত্তির ক্যালকুলেশন |
|---|---|---|
| আমদানি | | কাস্টমস অ্যাসেসমেন্ট ভ্যালু + শুল্ক কর + সম্পূরক কর |
| স্থানীয় | ক) পণ্য (ম্যানুফেকচারিং) | উৎপাদন খরচ + মুনাফা এবং কমিশন + সম্পূরক কর |
| | খ) সেবা | মূসক ব্যতীত সব মোট পরিমাণের রশিদ, সম্পূরক শুল্কসহ রশিদ |

## ৬.৩ মূসক রেয়াত[৮৯]

দ্রব্য বা সেবার উৎপাদনের উপকরণের ওপর প্রদত্ত করকেই 'উপকরণ কর' বলে অভিহিত করা হয়। পণ্য সরবরাহকারী/সেবা প্রদানকারী বা ব্যবসায়ীদের মধ্যে যারা ১৫ শতাংশ হারে মূসক প্রদান করে তারা মূসক রেয়াত পাওয়ার জন্য যোগ্য। উল্লেখ্য, টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত করদাতা এবং ট্যারিফ বা স্বল্প মূল্যের পণ্য সরবরাহকারীরা মূসক রেয়াত পাবে না।

---

৮৮ The merged units will cross-check the sales figure of big taxpayers so that they cannot conceal actual information

৮৯ Anyone can claim on VAT refund after the day on entering of all inputs into factory or business center within 30 days of the supply. It is noted here that without entering of all inputs of any Challan into factory or trade center no other refund can be claimed. 100 % refund is not applicable for the following cases - i) 80 % of the paid VAT against the insurance, gas and electricity bill; ii) 60 % of the paid VAT against LC of Telephone, Tele-printer, Fax, Internet, Freight Forward, C&F agents, WASA, Audit Accounting Firms, Supplier, Security Service, Law Advisor, and Transport. Only VAT refund is applicable in case of uses of inputs for the taxable services

### ৬.৪ মূসক বিভাগে চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ

Whether the burden of ultimate payment of VAT lies with the consumers (of both intermediate and final goods) needs to be clarified in VAT laws and rules.[৯০] The VAT registered units are VAT collectors and this point is yet to be properly addressed in the VAT law and rules[৯১]. প্রায় ২৫ শতাংশ খুচরা বিক্রেতাকে মূসকের আওতায় নিয়ে আসা হলেও ৭৫ শতাংশ মূসকের আওতার বাইরে আছেন[৯২]। মূসক-রেজিস্টার্ড ইউনিটসমূহের দায়িত্বসমূহ আইন দ্বারা নির্ধারিত আছে কিন্তু ভোক্তার ভূমিকাসমূহ নির্ধারিত নয়। ৫৫% মূসক প্রদানকারী মূসক রেয়াত পাওয়ার জন্য পুনরায় কাগজপত্র জমা দিতে হয়েছিল।

জরিপকৃত ৩১৮টি মূসক ইউনিটের ৩৯ শতাংশ দোকান এবং স্টোর, ৯.১ শতাংশ এসএমই এবং ১৬.৭ শতাংশ অন্যান্য ট্রেডিং সংস্থাসমূহ (পরিশিষ্ট ১৭)। জরিপকৃত ২২৯টি মূসক ইউনিটের উত্তরদাতার মধ্যে ৩৫.৪ শতাংশ কর কর্মকর্তাদের অসততা এবং ৩২.৩ শতাংশ পদ্ধতিগত জটিলতার কথা বলেছেন (পরিশিষ্ট ১৮)। কর সংগ্রাহকদের অসততার কারণে মূসক ইউনিটরা দুই ধরনের হয়রানির শিকার হয়। জরিপকৃত ব্যবসায়ীদের অর্ধেকের বেশি কাগজপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ বিভিন্ন প্রকার হয়রানি (২১%) হয়; অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্রের তালিকা প্রদান; ঘুষ দাবি এবং এক টেবিল থেকে অন্য টেবিল ঘোরানোর মাধ্যমে হয়রানি করে থাকে। ৫৫% মূসক প্রদানকারী মূসক রেয়াত পাওয়ার জন্য পুনরায় কাগজপত্র জমা দেয়া হয়েছিল, সারণি ৭ এ মূসক কার্যক্রমে চ্যালেঞ্জসমূহ বর্ণিত হল:

**সারণি ৭: মূসক কার্যক্রমে চ্যালেঞ্জসমূহ**

| কার্যক্রম | সমস্যা ও অনিয়মের প্রকৃতি |
|---|---|
| প্রশাসন | • মূসক কমিশনারেটগুলো স্থানীয় অফিসগুলোর সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত না থাকা<br>• মূসক পদ্ধতি বুঝতে পুরাতন কর্মচারীদের অক্ষমতা এবং অদক্ষতা<br>• কর সংগ্রহের বছর/পণ্য ভিত্তিক তথ্য সার্কেল/প্রধান অফিসে না থাকা |
| নিবন্ধন প্রক্রিয়া | • ম্যানুয়াল নিবন্ধন-হয়রানির সুযোগ<br>• কম্পিউটারাইজেশনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অনাগ্রহ |
| অ্যাসেসমেন্ট | • অ্যাসেসমেন্ট প্রক্রিয়ায় হয়রানি<br>• অ্যাসেসমেন্টর সময় ব্যবসার উত্থান-পতন বা আয় বৃদ্ধি-হ্রাস বিচার না করার অভিযোগ |
| সংগ্রহ | • পরিদর্শকের সাথে যোগসাজসে মূসক ফাঁকি ও পরিহার করার চর্চা |
| নিরীক্ষা | • রিপোর্ট দাখিলে বিলম্ব<br>• অডিটরদের মূসক আত্মসাৎ বা গোপন বিক্রি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে অদক্ষতা<br>• মূসক প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে জালিয়াতি |

এছাড়া, মূসক কমিশনাররা তৃণমূল পর্যায়ের অফিসারদের সাথে দুর্বল যোগাযোগের কারণে কর্মদক্ষতাও কাঙ্ক্ষিত মানসম্পন্ন হচ্ছেনা।[৯৩]

### ৬.৫ মূসক অ্যাসেসমেন্টের ভিত্তি

মূসক রেজিস্ট্রেশন যাদের আছে তাদের মধ্যে ৫৪.৭% এর মাসিক বা বাৎসরিক এ্যাসেসমেন্ট হয় এবং ২৩.৫% এর ক্ষেত্রে সমগ্র বিক্রির বিপরীতে অ্যাসেসমেন্ট হয় (দেখুন পরিশিষ্ট ১৯)। আমদানি পণ্যের ওপর ৩ গুণ বেশি মূসক আদায় করে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের। ১৫% মূসক আমদানিকালে এবং পাইকারি দ্রব্যের ওপর ১.৫% হারে মূসক খুচরা বিক্রির ওপর প্রদান করতে হয়। এনবিআর ব্যাপকহারে ইসিআর চালু করতে চাচ্ছে, তবে তা সার্বজনীন ব্যবহার নিশ্চিত করা এনবিআরের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ ।

[৯০] রাজস্ব সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট পৃষ্ঠা: ৩৪৭
[৯১] প্রাগুক্ত।.
[৯২] মুখ্য তথ্যদাতা।
[৯৩] Revenue Reform Commission Report, Govt. of Bangladesh, 2003, Section 6.7.1, Page 399

### ৬.৬ মূসক ভিত্তি এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা

মূসক রেজিস্ট্রেশন আছে এ ধরনের ৩২.৭% মূসক প্রদানকারী বর্তমান প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা থাকার কথা বলেছেন। এছাড়া, ৫.৮% উত্তরদাতার প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই বলে জানিয়ে দিলেন।

### ৬.৭ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের অনুপস্থিতিতে মূসক নির্ধারণ পদ্ধতি

উপযুক্ত মূসক প্রদানকারীরা (উৎপাদনকারী এবং বিক্রেতা) উপকরণ বিক্রেতাদের নিকট থেকে ক্রয়ের ভাউচার না পাওয়ায় মূসক ক্রেডিট বা সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতার সম্মুখীন হয়। এ ধরনের ক্ষেত্রে, কর পরিদর্শকরা চূড়ান্ত ভিত্তি/নির্দিষ্ট মূল্য সংযোজনকে ভিত্তিরূপে গণ্য করে[৯৪]। জরিপে প্রায় ১৭% উত্তরদাতা ইন্সপেক্টরদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এবং অন্যভাবে প্রভাব বিস্তারপূর্বক মূসক প্রদান করেন (দেখুন পরিশিষ্ট ২০)।

### ৬.৮ মূসক সেবার মান

জরিপে[৯৫] ৭৯% করদাতা বলেছে, কর সংগ্রাহকদের অসততা এবং কাগজপত্র সম্পর্কিত ঝামেলার কারণে এই পদ্ধতি জটিল। প্রায় ৬৭% মূসক প্রদানকারী অ্যাসেসমেন্টর সময় এবং মূসক নির্ধারণের সময় হয়রানির সম্মুখীন হয়। ২৯৮ জন ব্যবসায়ীদের মধ্যে যারা মূসক প্রদান করেছে তাদের ৫৮.১% বলেছে, তারা ঘুষ প্রদান না করার জন্য হয়রানির সম্মুখীন হয়। উত্তরদাতাদের মতে, ৬৫.৩% তাদের বিরুদ্ধে মামলা করার হুমকি, ৫৭.৩% অপ্রয়োজনীয় অনেক কাগজপত্র প্রদান করার জন্য চাপ দেয়া এবং ৫২% এনবিআরের স্টাফ দ্বারা খারাপ ব্যবহারের অভিযোগ করেছে (দেখুন পরিশিষ্ট ২১)। একের অধিক হয়রানির সম্মুখীন হয়েছেন যেসব মূসক প্রদানকারী তন্মধ্যে ৫৫.২% দেরি হওয়া, ৫৪.৩% মূসক কর্মকর্তা/কর্মচারী দ্বারা বিভিন্ন কাগজপত্র দেয়া এবং ৩৩.৬% বিভিন্ন টেবিলে ফাইল ঘোরার মাধ্যমে হয়রানির সম্মুখীন হওয়ার কথা বলেছেন (পরিশিষ্ট ২২)।

মূসক রেয়াতের জন্য ৫৫% করদাতাকে দাবিকৃত কাগজপত্র পুনরায় দাখিল করতে হয়েছে (দেখুন পরিশিষ্ট ২৩)। এফজিডি থেকে প্রাপ্ত, ট্রেডার্স/ ব্যবসায়ী দাবি করেন, ট্রেডার্স এবং দোকান মালিকরা প্যাকেজ সিস্টেমে মূসক প্রদান না করলে তারা কর সংগ্রাহক দ্বারা অ্যাসেসমেন্টর সময় মামলা করার হুমকি পেয়ে থাকে, অনেক ক্ষেত্রে দোকান বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দেয় বলে জানিয়েছেন। জরিপে (২০০৮) প্রাপ্ত তথ্য মতে, ব্যবসায়ী ঘুষ দিতে বাধ্য হয় কয়েকটি কারণে যেমন,- ১) ঠিক সময়ে মূসক রেয়াত পাওয়া; ২) অডিটর দ্বারা ইন্সপেকশনের সময়; ৩) ভেরিফিকেশন চিঠি পাওয়ার জন্য; ৪) চেক ইস্যু অথবা টাকা বিতরণের সময়; ৫) রেয়াতের টাকা বা চেকের রশিদ পাওয়া এবং মূসক প্রদানের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার জন্য ঘুষ প্রদান অন্যতম (দেখুন পরিশিষ্ট ২৪)।

### ৬.৯ মূসক ফাঁকি এবং ইলেকট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার (ইসিআর) চালু

এনবিআর প্রাথমিকভাবে ঢাকার বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, শপিং মল, বাণিজ্যিক সংস্থা, মিস্টির দোকানসহ প্রায় ৫১,০০০ ব্যবসায়ী এন্টারপ্রাইজকে ২০১২ সালের মধ্যে ইসিআর চালু বাধ্যতামূলক করলেও ব্যবসায়ীরা ইসিআর চালু করতে আগ্রহী নয়। ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত মাত্র ৭১১টি এন্টারপ্রাইজ ইসিআরের প্রচলন করে। সাধারণ আর্থিক হিসেবে, যদি বিক্রয় কর হার ১০% অতিক্রম করে, সাধারণ মানুষ ব্যাপক হারে কর ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা শুরু করে, যেমন (ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্রয়, ব্যবসায়ী হতে আগ্রহী), পাইকারী বিক্রয় থেকে ক্রয়, কর্মচারীরর মাধ্যমে পণ্য ক্রয়। তথাপি, সংগ্রহ পদ্ধতির কারণে প্রতারণা করার সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পায় বলে সরকারের রাজস্ব সংগ্রহে অনেক ক্ষতি হয়ে যায়।[৯৬] এনজিও বিষয়ক গবেষণায় দেখা যায়[৯৭] ৬৬% এনজিও মূসক ফাঁকিতে জড়িত। ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত মাত্র ৭১১টি এন্টারপ্রাইজে ইসিআরের প্রচলন করে। তারপরও এনবিআর ব্যবসায়ী, এসোসিয়েশন এবং গ্রুপগুলোর সাথে আলোচনাপূর্বক করে চেষ্টা করছে ব্যপক হারে ইসিআরের ব্যবহার চালু করতে (এফজিডি ২০১০)। ইসিআর প্রচলনে নিম্নোক্ত সমস্যা চিহ্নিত করেছেন:

---

[৯৪] In order to remove this operational difficulty, fixed bases such as 10%, 25%, 30%, and 60% value addition is taken into account for calculation of VAT for a number of goods and services. In such circumstances net VAT rate for different rates of value addition comes to 1.5%, 2.25%, 4.5%, 9%.

[৯৫] সংযুক্তি-১২

[৯৬] http://en.wikipedia.org/wiki/VAT#VAT_Rates

[৯৭] Ashfaqul Amin Mukut, 'Irregularities of NGOs in dealing with Foreign Aid' (mimeo).

- সংগৃহীত বা বিয়োজিত মূসকের পুরো/অংশবিশেষ আত্মসাৎ
- প্রায় সকল মূসকযোগ্য প্রতিষ্ঠানের সাথে স্টাফদের অনৈতিক আর্থিক যোগাযোগ
- প্যাকেজ পদ্ধতিতে মূসক প্রদানকারী ইসিআর পদ্ধতিতে মূসক প্রদানে আগ্রহী নয়
- ব্যবসারীদের ইসিআর সম্বন্ধে কোন প্রশিক্ষণ না দেয়া
- ক্রেতাদের ইসিআর ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব জরিপকৃত ৩২৩টি মূসক ইউনিটের পক্ষে উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫২.৬% বলেছেন যে, মূসক নির্ধারণের পদ্ধতি তারা জানে না।

মূসক রেজিস্ট্রেশন এবং সংগ্রহ পদ্ধতি সহজ করার জন্য এনবিআর নানা সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি, তথ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে না পারার কারণে সম্ভাব্য মূসক সংগ্রহ কার্যক্রম নিশ্চিত হতে পারছে না।

**বক্স ১৩: ইসিআর ব্যবহার**

এনবিআর প্রাথমিকভাবে ঢাকার বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, শপিং মল, বাণিজ্যিক সংস্থা, মিস্টির দোকানগুলো মূসকের আওতায় এনেছে প্রায় ৫১,০০০ ব্যবসায়ী এন্টারপ্রাইজ এবং ২০১২ সালের মধ্যে সবার জন্য বাধ্যতামূলক করেছে। দুভাগ্যবশত কর এড়ানোর জন্য ব্যবসায়ীরা ইসিআর চালু করতে আগ্রহী নয়; কিন্তু ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত মাত্র ৭১১ এন্টারপ্রাইজে ইসিআরের প্রচলন করে। যারা চালু করেছে তারা দুধরণের মূল্য প্রচলন করছে; সেবাগ্রহীতা যদি মূল্য রশিদ চায় তাহলে অনেক অধিকমূল্যে তাদের ক্রয় করতে হচ্ছে এবং রশিদবিহীন কেনাকাটা করলে অনেক কম মূল্যে পাচ্ছে। বিশেষত: এধরণের ঘটনা, মিস্টির দোকান এবং বড় শপিং মলের দোকানগুলোতে এ ধরণের ঘটনা ঘটছে। ক্রেতারা বলেছে, বিক্রেতারা রশিদ না দেয়ার জন্য উৎসাহী থাকে এবং না চাইলে তারা ইসিআরের রশিদ প্রদান করে না। (সূত্র: পর্যবেক্ষণ, মে ২০১১)

সপ্তম অধ্যায়

# কর সম্পর্কিত আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি

করদাতা কর সংগ্রহকারী কর্তৃক ধার্যকৃত কর (আয়কর, কর্পোরেট কর, আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক, সম্পূরক কর বা মূসক) সম্বন্ধে একমত না হলে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর সংক্রান্ত আপিল এবং ট্রাইব্যুনালের সহায়তায় তা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। একজন করদাতা উপ-কর কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনার (আপিল)/অতিরিক্ত বা যুগ্ম কর কমিশনার এবং কর আপিল ট্রাইবুনালের নিকট আপিল করতে পারেন। অন্যদিকে, চাহিদাকৃত/প্রাপ্ত কর প্রদান না করলে একজন করদাতার বিরুদ্ধে পদক্ষেপসমূহ নেওয়া হয়, যেমন ১) ব্যাংক হিসাব, বেতন বা অন্য কোনো প্রদেয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা; এবং ২) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট সার্টিফিকেট কেস ফাইল করা।

**আপিল প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সমস্যাবলি**

হাইকোর্টে আপীল মামলা দায়ের হওয়ার পর সেইগুলি নিষ্পত্তি করা  বা  না করা হইকোর্টের এখতিয়ার। যেহেতু সুপ্রীমকোর্টের কাজের জবাবদিহিতা আদায়ের ক্ষমতা রাজস্ব বোর্ডের নেই সে কারণে যদি মামলা নিষ্পত্তি না করে তাহলে রাজস্ব বোর্ডের বাস্তবে কিছু করার নেই। হাইকোর্টে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি না হওয়ার পেছনে করদাতা এবং তাদের উকিলদের কারসাজি আছে। কারণ,  অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মামলার নিষ্পত্তি মানেই রায় এনবিআরের পক্ষে যাওয়া (বাস্তবে দেখা গেছে যে সকল মামলা হাইকোর্টে যায় সেগুলির বেশিরভাগ মামলায় করদাতাদের পক্ষে যাওয়ার মত যুক্তি থাকে না, কারণ ট্রাইবুনাল পর্যায়ে যে সকল রায় হয় সেগুলিতে করদাতারা যথেষ্ট সুবিধা পান), অবশিষ্ট প্রদেয় কর জমা দিতে বাধ্য হওয়া। আর এই অবধারিত প্রদেয় কর যাতে দিতে না হয় সে কারণে করদাতাদের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে বার বার সময় বাড়ানোর আবেদন করা হয় এবং হাইকোর্টও তাদের সময় বাড়ানোর আবেদন মঞ্জুর করে, ফলে রাজস্ব বোর্ডের মামলাগুলোর নিষ্পত্তি ঝুলে যায়। উল্লেখ্য, শুধু আয়কর বিভাগেই প্রতি বছর আপিল ষ্টেজে মোট মামলা দায়ের হয় মোটামুটি ২০,০০০টিরও বেশি, ২০০৯ সালের আগে তা ছিল কমপক্ষে দ্বিগুণ (কারণ ২০০৭-০৮ হইতে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতি চালু হওয়ার পর হতে আপিলে মামলা দায়ের আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে)। আর শুল্ক, মূসক মামলা সহ প্রতি বছরে হাইকোর্টে আপিল মামলা দায়েরের হার মোট আপিল মামলার ৫% এর অনেক কম। আপিল আদেশের বিরুদ্ধে ট্রাইবুনালে মামলা দায়ের হয় গড়ে মোটামুটি ২০% এর মত, ট্রাইবুনালের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয় ১% হইতে ২% পর্যন্ত। আপিল এবং ট্রাইবুনাল পর্যায়েই ৯৫% এর বেশি আয়কর মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যায়। এর প্রধান কারণ বেশিরভাগ করদাতাই টাকার বিনিময়ে হলেও আপীল-ট্রাইবুনালেই তাদের আয় তথা প্রদেয় কর অনেক কমিয়ে ফেলেন, সেক্ষেত্রে তাদেরকে হাইকোর্টে যাওয়ার প্রয়োজন এমনিতেই শেষ হয়ে যায়। আর অনেক মামলায় আপীল-ট্রাইবুনাল নীতিগত, আইনগত এবং ন্যায় বিচারের দিকে লক্ষ্য রেখে করদাতাদের আয় কমাতে বাধ্য হন। এরপরও ট্রাইবুনালের যে সকল আদেশে করদাতা এবং আয়কর বিভাগ সন্তুষ্ট  না হয় - কেবল সেগুলোই হাইকোর্টে যায়।

অনেক মামলায়  আয়কর বিভাগ আপীল আদেশের বিরুদ্ধে ট্রাইবুনালে এবং অনেক মামলায় ট্রাইবুনালের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল দায়ের করে। ২০০২-০৩ কর বৎসরে আয়কর উপদেষ্টাদের চাপে এমন আইন করা হয়েছিল যে তখন আপীল আদেশের বিরুদ্ধে আয়কর বিভাগের পক্ষ থেকে  ট্রাইবুনালে আপিল করা যেত না। এর ফলে অনেক মামলায় আপিল আদেশে  কর বিভাগের অনেক রাজস্ব ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তা উদ্ধারের জন্য কোন ব্যবস্থা নেয়া যায় নাই। তখন বাধ্য হয়ে আপিল আদেশ দানকারী এবং  রাজস্ব ক্ষতিগ্রস্তকারী কয়েকজন আপিল অফিসারের বিরুদ্ধে কর বিভাগের পক্ষ থেকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল এবং বাধ্য হয়ে পরের বছরেই উক্ত আইন পরিবর্তন করে পূর্বের অবস্থায় নিতে সরকার বাধ্য হয়েছিলেন। বর্তমানে যেহেতু আপিল অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে কর বিভাগ ট্রাইবুনালে আপিল দায়ের করতে পারে সে কারণে আপিল অফিসে নিয়োজিত কর বিভাগের অফিসারদের  বিরুদ্ধে বর্তমানে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে হয় না।

উল্লেখ্য, এনবিআর বিদ্যমান অবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যেমন ১) কর আপিল ট্রাইবুনালকে পুনর্গঠন করা; ২) একটি নতুন বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (Alternative Dispute Resoulation) ADR কাঠামো তৈরির মাধ্যমে মামলার সংখ্যা হ্রাস করা; ৩) শুল্ক সংক্রান্ত আপিল মামলার নিষ্পত্তি দ্রুততর করার জন্য অর্থবিল ২০১০-১১ এ Act IV of 1969 এর section 196A এর sub-section (৬) এর পর নতুন sub-section (৭) এবং (৮) এর মাধ্যমে আপিল নিষ্পত্তির সময়সীমা[৯৮] নির্ধারণ এবং ৪) রাজস্ব সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ২টি কোর্টকে পুরোপুরি নিয়োগ করা।

---

[৯৮] (7) The Appellate Tribunal shall dispose of the appeal within two years from the date of its receipt; (8) If the appeal is not disposed of within the time specified in sub-section (7), the appeal shall be deemed to have been allowed by the Appellate Tribunal.

সরকার আয়কর অধ্যাদেশের ১৫২(এফ) ধারায় এবং মূসক আইনের ৪১(ক) ধারায় 'বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তির' বিষয়টি আইনের অন্তর্ভুক্ত করেছে। এর মাধ্যমে বাদী ও বিবাদী আদালতের বাইরে আইনজীবির মধ্যস্ততায় বিরোধ নিস্পত্তি করতে পারবেন। কিন্তু এর বাস্তব প্রভাব জানতে আরো সময় লাগবে। ইতোমধ্যে কর আইনজীবি সমিতি এর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

**বক্স ১৪: আপিল ট্রাইবুনালে মামলার জট এবং রাজস্ব সংগ্রহে প্রভাব**

হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টে ১৭,৬৯১টি অমীমাংসিত কর সংক্রান্ত মামলার বিচার প্রক্রিয়ার জটিলতার কারণে ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছর থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত ৭৭.২৯ বিলিয়ন টাকার রাজস্ব এনবিআর-এর আওতার বাইরে চলে গেছে (এনবিআর, ২০০৯)। উল্লেখ্য যে, ২০০২ সাল পর্যন্ত কর আপিল ট্রাইবুনালের দুজন বিচারকের মধ্যে একজন থাকতেন জেলা জজ পর্যায়ের বিচারক এবং একজন কমিশনার। আয়কর অর্ডিন্যান্স ১৯৮৪ এর ১১ ধারার পরিবর্তন করে জেলা জজকে নিযুক্তির বিধান বাতিল করা হয়। ফলে, মামলাসমূহের ঘটনার সত্যতা থাকলেও আইনী দুর্বলতা থাকায় এনবিআর রাজস্ব হারাচ্ছে। অন্যদিকে, অভিযোগে আছে যে, ট্রাইবুনালে জুডিসিয়াল সদস্য বাধ্যতামূলক ছিল, কিন্তু তখন মামলার রায় পেতে ৫/৬ বছর সময় লাগত এবং ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ তখনো ছিল। কিন্তু এখন আয়কর ট্রাইবুনালে মামলা নিস্পত্তি ১৫০ দিনের মধ্যে হয়ে যায়। এ ধরনের অবস্থা হতে উত্তরণ করা তখনই সম্ভব যদি এনবিআর কার্যকর পদক্ষেপ নেয়, আপিল ট্রাইবুনালসমূহ তাদের রায় প্রদানে আরো যৌক্তিক হয় এবং বিজ্ঞ আইনজ্ঞদের সে আদালতে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। (সূত্রঃ এনবিআর, ২০১০)

২০১১-১২ অর্থ বছরের বাজেট বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে, বর্তমানে বিভিন্ন করখাতে ১৯ হাজার মামলা বিচারাধীন যার ফলে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না[৯৯]। ২০০৯-১০ সালের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী সকল মামলা নিস্পত্তির জন্য একটি 'জাতীয় ট্যাক্স ট্রাইবুনাল' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিলেও পরবর্তী পর্যায়ে আইনগত জটিলতার কারণে সে পরিকল্পনা বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। তার পরিবর্তে হাইকোর্টের ২টি বেঞ্চকে পুরোপুরি কর সংক্রান্ত সকল আপিল মামলার শুনানির জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। আপিল প্রক্রিয়ায় নিম্নলিখিত চ্যালেঞ্জসমূহ বিদ্যমানঃ

- আইন বিশেষজ্ঞের অপর্যাপ্ততা ও তাদের জবাবদিহিতার অভাব প্রভৃতি বিষয়ে নীতিনির্ধারকদের গুরুত্ব না দেয়া;
- বিচারকদের সীমিত স্বাধীনতা;
- সরকার এবং করদাতা উভয়ের সম্পদ এবং সময়ের অপচয়;
- হাইকোর্টে মামলার রায়ের জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করা এবং এজন্য দায়ী ব্যক্তির কোনো জবাবদিহি না করা;
- হাইকোর্টে এনবিআরের পক্ষে কার্যকর আইনি পদক্ষেপের অভাবে বকেয়া রাজস্ব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় না;
- সৎ করদাতাগণ আইনবহির্ভূত পদক্ষেপের কারণে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত;
- এনবিআর কর সংক্রান্ত মামলায় কর স্টাফের অনৈতিক যোগসাজশ এবং অবৈধ প্রভাব।

করদাতা ন্যায়ানুগ এবং দ্রুত রায় প্রত্যাশা করে, কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছেনা। এছাড়াও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল।

## ৭.১ ধারা ৩০এ-এর অধীনে Disallowance

ধারা ৩০-এর আওতায় সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ ব্যতিরেকে কোনো দাবিকে প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। কিন্তু কর কর্মকর্তারা এই ধারা অনুসরণ করে না। প্রায়ই তারা এর কারণ ব্যাখ্যা করে না। এই সেকশনের কার্যকরী প্রয়োগ রাজস্ব সংগ্রহকে দ্রুত করে মামলা এড়ানো সম্ভব। কেবল যে সব ক্ষেত্রে আইনগত পয়েন্ট রয়েছে সেগুলোই উচ্চ আদালতে মাননীয় বিচারকদের মতামতের জন্য প্রেরণ করা যেতে পারে।

## ৭.২ আয়কর আইন, নিয়মের ক্ষেত্রে জ্ঞানের ঘাটতি

এনবিআর-এর নিম্ন থেকে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কর আইন ও নিয়ম সংক্রান্ত জ্ঞানের অনেক ঘাটতি রয়েছে। এনবিআর-এ এ সংক্রান্ত কোনো কার্যকর প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থাও নেই। এর ফলে কর নির্ধারণ প্রশ্নবিদ্ধ হয় এবং উচ্চ আদালতে অ্যাসেসমেন্টকৃত রিটার্ন ক্ষুদ্ধ করদাতাদের দ্বারা অহরহ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।

[৯৯] ২০১১-১২ অর্থ বছরের বাজেট বক্তব্য, পৃ.১৩১

## ৭.৩ আপিল প্রক্রিয়ায় দাখিলকৃত কাগজপত্র নিরীক্ষার ক্ষেত্রে অনিয়ম/অসংগতি

আপিল আদেশের সকল কপি বাধ্যতামূলকভাবে এনবিআর-এ প্রেরণ করা। এনবিআর অনেক ক্ষেত্রেই আপিল কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করে না মামলার মেরিট থাকা সত্ত্বেও কেন তারা কাঙ্ক্ষিত রায় দিচ্ছে না। ফলে, আপিল আবেদনকারীকে কর আপিল ট্রাইবুন্যালে আবেদন করতে হয় এবং বিচার পেতে অনেক বিলম্ব হয় বলে সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে। ট্রাইবুনালে সন্তোষজনক বিচার না পেলে এসব মামলা আবার উচ্চ আদালতে ফাইল করা হয়। যেখানে বিচার পেতে প্রায় ৫ বছর লেগে যায়। কিন্তু আপিল কর্তৃপক্ষ যদি তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সুবিবেচক হতেন তাহলে সরকারকে রাজস্ব আদায়ের জন্য এই দীর্ঘ ৫ বছর অপেক্ষা করতে হতো না। (উৎস: মুখ্য উত্তরদাতা, আইন বিশেষজ্ঞ, ২০০৯)

## ৭.৪ আপিল কর্তৃপক্ষে কর কর্মকর্তা

এই মুহূর্তে দেশে ৭টি ট্রাইবুনাল বেঞ্চ রয়েছে তার মধ্যে ৫টি ঢাকায়, চট্টগ্রামে ১টি এবং খুলনায় ১টি। ট্রাইবুনালের বর্তমানে ১৪ জন সদস্যের মধ্যে ১২ জন কর্মরত রয়েছেন। যখন এই সদস্যরা বেঞ্চে নিয়োগপ্রাপ্ত হন তারা তাদের কার্যক্রম চালাতে গিয়ে নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হন। কারণ তারা ট্রাইবুনালে যোগদানের পূর্বে কখনো ট্রাইবুনালের রায় লেখেননি। একজন প্রশাসনিক ব্যক্তি রাতারাতি একজন বিচারক হয়ে যাবেন এটা আশা করা যায় না। এমনকি তারা ট্রাইবুনাল প্রক্রিয়ায়ও অভ্যস্ত নন এবং অতীতের মামলা সংক্রান্ত আইনের বিষয়েও তারা অবহিতও নন যা জানা তাদের জন্য একটি পক্ষপাতহীন রায় দেয়ার ক্ষেত্রে খুবই জরুরি।

করদাতারা প্রথমেই উপ-কর কমিশনার (ডিসিটি) কর্তৃক হয়রানির শিকার হয়, অতপর আপিল করে সেখানেও এনবিআরের স্টাফদের সম্মুখীন হয়। পরবর্তী পর্যায়ে কর ট্রাইবুনালে গেলে যেখানে এনবিআর থেকে দুইজন সদস্য থাকে, সেখানে আরও বেশি হয়রানির শিকার হয় বলে জানিয়েছেন এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা। যে বা যার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ সে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিই বিচারক হওয়ায় ফলে সার্বিক আপিল প্রক্রিয়াতে আপিলকারী ন্যায়বিচার হতে বঞ্চিত হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

## ৭.৫ বিচারকদের সীমিত স্বাধীনতা

আপিল আদালতের বিচারক সদস্যরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন না। যেহেতু এসব সদস্য সাময়িক সময়ের জন্য এনবিআর হতে নিয়োগপ্রাপ্ত হয় সেহেতু এনবিআর-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অ্যাসেসম্যান্টের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কায় আপিলকারীর প্রাপ্য ন্যায়বিচার প্রদান না করার বকোধিক আভিযোগ আছে। এরা নিজের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) নিয়ে ভয়ে থাকেন। উল্লেখ্য, পদোন্নতি, কাঙ্ক্ষিত পদে বা স্থানে (?) বদলি - এ সবকিছুই এসিআর-এর ওপর নির্ভর করে। সবচেয়ে গুরুত্বপর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, এসিআর, পদোন্নতি এবং ভবিষ্যৎ-এ পছন্দমত বদলির সুবিধা পাওয়ার জন্য তাদেরকে এনবিআর-এর সুনজরে থাকতে হয়। এ কারণেই তারা পক্ষপাতদুষ্টতা দেখায়। ভাল কাজ করার ক্ষেত্রেও তাদের কোনো উৎসাহব্যঞ্জক পুরস্কার দেওয়া হয় না, এর ফলে এনবিআর এর স্বার্থই তাদের স্বার্থ। একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে তার ভূমিকা একজন বিচারকের ভূমিকার সাথে বিরোধপূর্ণ (উৎস: মুখ্য তথ্যদাতা)।

## ৭.৬ আপিল রায়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতি

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিচারক সরকারের রাজস্ব রক্ষার অজুহাতে ডিসিটি'র কর আদেশে কোনো পরিবর্তন আনেন না। এটি এক ধরনের পক্ষপাতিত্ব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করদাতা সুবিচার না পাওয়ার আশঙ্কা প্রবল থাকে। অনেক সময় অবৈধ অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে ক্ষুব্ধ/ক্ষতিগ্রস্ত করদাতা কাঙ্ক্ষিত বিচার পেতে পারেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিচারক যদি তার চাহিদা অনুযায়ী অর্থ না পান তাহলে করদাতার আপিলের জবাব ডিসিটি-র অ্যাসেসম্যান্ট, যা ভ্রান্ত হলেও প্রায়ই রায় তার পক্ষেই যায়। এমনও অভিযোগ আছে যে, আদালতে খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই আছেন যারা ঘুষ গ্রহণ করেন না।

## ৭.৭ হয়রানিযুক্ত মামলা প্রক্রিয়া

যে সকল করদাতা কর সংক্রান্ত মামলা বা আপিল করেছিলেন তারা তিন ধরনের হয়রানির সম্মুখীন হন। ২৭.৪% (সর্বাধিক) করদাতা রায় প্রাপ্তিতে দেরি এবং আপিলে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানে বাধ্য হওয়া, প্রায় ২০% পক্ষপাতদুষ্ট/অন্যায্য রায় পাওয়া, ১৮.৯% ট্রাইবুন্যাল স্টাফদের হয়রানির কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বিচারের রায় পেতে গড়ে ৯ মাস সময় লাগার কথা জানিয়েছেন (দেখুন পরিশিষ্ট ১০)। তবে বর্তমানে ২ বছরের মধ্যে সকল আপিল মামলার নিস্পত্তি বিধানের আইনি বাধ্যতা রয়েছে।

সারণি ৮: মামলা প্রক্রিয়ার সময় হয়রানি/সমস্যাসমূহ

| হয়রানির ধরন | উত্তরদাতার হার (%) |
|---|---|
| রায় পেতে বিলম্ব | ২৭.৪ |
| আপিলের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় | ২৭.৪ |
| বিতর্কিত রায় | ১৯.৮ |
| হয়রানি | ১৮.৯ |
| অন্যান্য | ৬.৬ |

উৎস: আয়করদাতা জরিপ, ২০০৮

জরিপকৃত মূসকদাতাদের মতে, মামলার শুনানি এবং আপিলের রায়ের ক্ষেত্রে একাধিক হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়। ৮৫.৭% মামলার ক্ষেত্রে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতার সম্মুখীন হওয়া এবং ৫৭.১% আপিল বাবদ ঘুষ প্রদানের করার কথা বলেছেন (দেখুন পরিশিষ্ট ২৫)।

করদাতার হয়রানি কমানো এবং বকেয়া রাজস্ব পুনরুদ্ধারের জন্য আপিল প্রক্রিয়া সহজ এবং সময়োচিত হওয়া উচিত। হাইকোর্টের দুইটি বেঞ্চকে যদি কর সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া যায় তাহলে প্রক্রিয়াটি আরও দ্রুত হবে। ট্রাইবুনালের বিচারকদের রায় প্রদানের সময় কর আইনের পুনর্গঠন এবং সঠিক চর্চার মাধ্যমে সুবিচার নিশ্চিত হতে পারে। অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ কত দ্রুত সম্পন্ন হবে তা নির্ভর করে সরকার উচ্চ আদালত এবং এনবিআর কর্তৃক প্রস্তাবকৃত মামলাসমূহ কত দ্রুত নিষ্পত্তি হবে তার ওপর।

অষ্টম অধ্যায়

# কর ন্যায়পাল: একটি হারানো সুযোগ

বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদ এবং UNCAC এর অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হওয়ায় বাংলাদেশ দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন ন্যায়পাল পদ প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২০০৫ সালে কর ন্যায়পাল আইনের অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থা দেশের কর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সৃষ্টি হলেও এ নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রায় এক বছর সময় লাগে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রথম ন্যায়পাল অর্থাৎ কর ন্যায়পাল পদটি ইতোমধ্যে বিলুপ্ত করা হয়েছে। কর ন্যায়পালের দায়িত্বসমূহ ছিল নিম্নরূপ: ১) এনবিআর এবং কর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের অভিযোগ অনুসন্ধান করা, ২) যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সমন জারি, কর উত্তোলক ব্যক্তির অনৈতিক কার্যকলাপ চিহ্নিতকরণ, সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরাময়ে পরামর্শ প্রদান এবং রাজস্ব প্রশাসনে সংশোধনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা; ৩) কর কর্মকর্তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা; ৪) কর সংগ্রহকারী এবং করদাতার মধ্যকার ভুল বোঝাবুঝির ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কর্ম সম্পাদন; ৫) অনুসন্ধানের প্রয়োজনে যে কোনো বাড়ি, মাঠ, স্থান, যন্ত্রপাতি, বই এবং কাগজপত্র তল্লাশি করা; ৬) এনবিআর এবং কর কর্মকর্তা কর্তৃক কেউ হয়রানির শিকার হলে জরিমানা প্রদান; ৭) যে কোনো ধরনের বৈষম্য এবং অসমতা প্রতিরোধ এবং নিরপেক্ষতা প্রদর্শন। উল্লেখ্য যে, এই প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিধি এবং কার্যক্রমের প্রকৃতির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ হওয়া উচিত ছিল, ক) যে কোনো ধরনের প্রেষণা ও প্রভাব মুক্ত একটি নিরপেক্ষ অফিস; খ) সহজভাবে সেবা পাওয়া এবং মামলা দায়েরের জন্য সরল ও সহজ প্রক্রিয়া; গ) এনবিআর-এর সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে সংস্কার কার্যক্রম সম্পাদন; ঘ) দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রস্তুতি; ঙ) বাড়তি-বিচারিক ক্ষমতার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অথবা যে কোনো অভিযোগ মীমাংসা করা; চ) অসাধারণ এবং বিশেষ কাজের জন্য পুরস্কার প্রদান। বাস্তবে এ প্রতিষ্ঠানটি কতটুকু অবদান রাখতে পেরেছে বা কতটুকু কার্যকর ছিল তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

### ৮.১ নিয়োগ, যোগ্যতা ও চাকরিকাল বিধি

সংসদের অনুপস্থিতিতে, একটি Search Committee[১০০] এর সুপারিশে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ন্যায়পাল নিযুক্ত হতে পারতেন। একজন ন্যায়পালকে অবশ্যই সৎ, নির্দলীয়, বিশ্বাসযোগ্য এবং পেশাগত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি হতে হবে। জাতীয় জীবনে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকতে হবে। একজন ন্যায়পাল ৫ বছরের জন্য নিয়োজিত হবেন (এ্যাক্ট-এ উল্লেখিত ৩ বছর নয়)।

### ৮.২ বাজেট

২০০৬-২০০৭ অর্থবছরে কর ন্যায়পাল ৩৬.৬ লাখ টাকা বরাদ্দ পেয়েছিল, তার মধ্যে ১২ লাখ টাকা স্টাফদের বেতন, ১০ লাখ টাকা সরবরাহ ও সার্ভিস, ১৪.৬ লাখ টাকা সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়, এবং ৯.৫ লাখ টাকা আসবাব ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত ছিল, কিন্তু বাজেট বরাদ্দে দীর্ঘসূত্রতার সম্মুখীন হয়েছিল।

### ৮.৩ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং লজিস্টিকস

বিলুপ্ত কর ন্যায়পাল আইন (সেকশন ৯) অনুযায়ী, ন্যায়পাল তার স্টাফ নিয়োগের অনুমোদনের জন্য সরকারের ওপর নির্ভরশীল ছিল। সরকার কর ন্যায়পালের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৪০ জন স্টাফ বরাদ্দ করলেও অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি উপ-শাখা কর ন্যায়পালের সার্বিক বাজেট নিয়ন্ত্রণ করতো। কিন্তু একটি স্বাধীন সংস্থা হিসেবে এর সকল ব্যয় অনুমোদনের ক্ষমতা এ সংস্থারই এখতিয়ারভুক্ত থাকা উচিত ছিল।

### ৮.৪ উদ্যোগ

কর ন্যায়পাল তার কার্যক্রমকে পরিচিত করার জন্য একটি পুস্তিকার মাধ্যমে ক্যাম্পেইন শুরু করে এবং পুস্তিকাটি প্রধান প্রধান স্টেকহোল্ডার যেমন এনবিআর, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সমিতিসমূহে এবং সংগঠনসমূহের মধ্যে এটি বিতরণ করা হয়। তারা বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ যেমন আইনজীবী এসোসিয়েশন, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টের জন্য অভিযোগ দায়েরের প্রক্রিয়া, অনুসন্ধান পরিচালনা এবং মামলা খারিজ কার্যক্রম সংক্রান্ত আলোচনা ও মতামত প্রভৃতি আয়োজন করে।

---

[১০০] নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের এই কমিটির সদস্য হওয়ার কথা: ১. প্রধান বিচারপতি অথবা তার মনোনীত ব্যক্তি; ২. একজন অবসরপ্রাপ্ত কেবিনেট সেক্রেটারি/চিফ এক্সিকিউটিভ/ প্রধান নির্বাহী কর্তৃক মনোনীত সৎ ও বিশ্বাসযোগ্য সচিব; ৩. সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি; ৪. প্রধান নির্বাহী কর্তৃক মনোনীত একজন বিশিষ্ট নাগরিক; ৫. দুদক চেয়ারম্যান।

### ৮.৫ অর্জন

২০০৬ এবং ২০০৭ সালে কর ন্যায়পাল দুইটি বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রদান করেছিল, ২০০৮ সালে প্রত্যক্ষ কর বিষয়ক অভিযোগে ৮৫.৩% এবং পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে ৫০% অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়েছিল। নিয়মিতভাবে কর কর্মকর্তাদের উৎসাহ প্রদান এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ওপর রিপোর্ট প্রদানসহ কর ন্যায়পাল কার্যালয় দাবি করে যে, তাদের উদ্যোগের কারণে নিম্নের অগ্রগতিসমূহ সাধিত হয়েছিলঃ

- দ্রুততার সাথে মামলা সমাধানে এনবিআর এর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- করদাতার অধিকার পূর্বের তুলনায় অধিকতর সংরক্ষণ;
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সামর্থ্য ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি;
- একই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি ঘটা সত্ত্বেও তুলনামূলক তা হ্রাস; এবং
- করদাতার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি।

**সারণি ৯: অভিযোগকৃত কেসসমূহের নিষ্পত্তি**

| অভিযোগ | প্রত্যক্ষ কর | | পরোক্ষ কর | |
|---|---|---|---|---|
| | অভিযোগ সংখ্যা | সমাধানের হার | অভিযোগ সংখ্যা | সমাধানের হার |
| গৃহীত | ৯৫ | ৮৫.৩% | ২৪ | ৫০.০% |
| রেজিস্ট্রিকৃত | ৩৪ | | ৮ | |
| খারিজকৃত | ২৯ | | ৪ | |

উৎসঃ কর ন্যায়পাল রিপোর্ট, ২০০৮

### ৮.৬ কর ন্যায়পালের মূল সীমাবদ্ধতাসমূহ

এই গবেষণায় কর ন্যায়পাল ব্যবস্থার নিম্নের সীমাবদ্ধতাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছিলঃ

**ক. আইনগত**

- ন্যায়পাল আইনের ধারা ১৫, এর অব্যাহতি সংক্রান্ত বিধি, সরকার যেকোনো সরকারি কর্মকর্তা অথবা সরকারি কর্মকর্তাদের একাংশকে অব্যাহতি দেওয়ার অধিকার প্রদান করেছিল। জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এটি বড় বাধা দিলো;
- ধারা ১৬ ন্যায়পালের নিজস্ব নিয়ম তৈরির ক্ষমতার সাথে বিরোধপূর্ণ ছিল;
- এই আইন অনুযায়ী, ন্যায়পালের আর্থিক বাজেট তৈরির কোনো সুযোগ ছিল না। অথচ জাতীয় বাজেটের "charged expenditure" ধরনের অধীন ন্যায়পালের নিজস্ব বাজেট গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকার কথা (ইফতেখারুজ্জামান, ২০০৭)।

**খ. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, লজিস্টিকস এবং বাজেট**

- কর ন্যায়পাল অফিসের কোনো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিলনা ফলে সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে কর ন্যায়পালের অফিস স্বাধীনভাবে কাজ করতে অপারগ ছিল;
- ২০০৭ সালের প্রথমদিকে প্রেরিত নিয়োগ নীতির খসড়া অনুমোদনে আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় নিয়োগ প্রদানে দেরি হয়েছিল;
- অপর্যাপ্ত লজিস্টিক এবং পরিবহণ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল।

**গ. কর্মপদ্ধতি**

- করদাতাগণ কর ন্যায়পালের কর্তৃত্ব নিয়ে উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন হতেন। ২০০৫ সালের আইনে কর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের বিষয়ে সিদ্ধান্ত/সুপারিশ প্রদান করার ক্ষমতা ছিল, কিন্তু এনবিআর কর্তৃক ন্যায়পালের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতার বিষয়টিও অস্পষ্ট ছিল;
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে এনবিআর এর কাঙ্ক্ষিত সহায়তা না পাওয়ার অভিযোগগুলোর সময়মতো বিলম্বে নিষ্পত্তি হয়েছিল;
- কর বা শুল্ক বৈধতার বিষয়ে কোনো আইনগত সিদ্ধান্ত প্রদান না করা;
- গবেষণা বিভাগ থাকলেও নিয়োগের অনুমোদন না করায় এবং আর্থিক সঙ্কটে সে বিভাগে কোনো স্টাফ নিয়োগ দেওয়া হয় নি;

- করদাতা আয়/সম্পত্তি সম্পর্কে সঠিক তথ্যটি গোপন করার ফলে কর্মকর্তাগণ তথ্য যাচাই এবং প্রকৃত কর ধার্য করতে ব্যর্থ হয়;
- ২০০৯ সাল পর্যন্ত কর ন্যায়পালের অফিসে ৭২৫টি অভিযোগ করা হয় তার মধ্যে ৩৩৪টি রেজিস্ট্রিকৃত এবং ৩০৪টি সাধারণ অভিযোগ মীমাংসা করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব এবং অপর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্যের কারণে কর ন্যায়পাল আশানুরূপ সেবা দিতে ব্যর্থ হয়। দেখা যায় যে, ভূক্তভোগী করদাতাদের সহায়তার জন্য কর ন্যায়পাল অনেক প্রচারণা চালালেও নিম্নের কারণগুলোর জন্য এই প্রক্রিয়া সফল হয়নি:
- এনবিআর-এর সাথে দুর্বল যোগাযোগ;
- ভুক্তভোগী করদাতা খুব দ্রুত অভিযোগের নিষ্পত্তি এবং সমাধানে আগ্রহী;
- এনবিআরের কাজের অগ্রগতি অনুসন্ধান করা হয় না তাই সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে অনীহা প্রদর্শন; এবং
- সর্বোপরি কর ন্যায়পালের আইনি সীমাবদ্ধতার দরুন কর সংগ্রহকারীদের উপর সেবাগ্রহীতাদের বিশ্বাস এবং নির্ভরতা কম ছিল।

**ঘ. এখতিয়ার**

১৯৮০ সালের আইনের অধীনে মন্ত্রী, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং সরকারি কর্মকর্তা কর ন্যায়পালের আওতাভুক্ত। অবশ্য সরকারের কর্তা ব্যক্তি কর্তৃক অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ এর আওতাভুক্ত নয়।

**ঙ. তথ্য প্রকাশ না করা**

ন্যায়পালের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এর কার্যক্রম বিষয়ে সকল তথ্য, অভিযোগের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ প্রকাশ করার বিধান থাকা গুরুত্বপূর্ণ। কর ন্যায়পালের বাৎসরিক প্রতিবেদনে, অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশিত হয়নি।

একটি নিরপেক্ষ পক্ষ হিসেবে অনেক দেশেই কর ন্যায়পাল একটি কার্যকরী ওয়াচডগ। কিন্তু, বাংলাদেশে সরকার এই সংস্থাকে কার্যকর করার জন্য উদ্যোগী নয় এবং এনবিআর দুর্নীতি হ্রাস করার জন্য বরং ন্যয়পালকে গুরুত্বহীন বিবেচনা করে এটিকে বিলুপ্ত করা হয়। ন্যায়পালের সাথে সহযোগিতায় আগ্রহী ছিল না।

নবম অধ্যায়

# উপসংহার এবং সুপারিশসমূহ

এই গবেষণায় এনবিআরের নীতিনির্ধারণী, আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক এবং কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পর্যালোচনা করে সমস্যার প্রকৃতি, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার সমস্যা, অনিয়ম, দুর্নীতি এবং হয়রানি প্রভৃতি বস্তুনিষ্ঠভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরা হল:

### নিম্ন কর-জিডিপি ফাঁদ ও এনবিআরের সীমিত ক্ষমতা

নিম্ন কর-জিডিপি হার রাজস্ব সংগ্রহে অন্যতম বাধা। এর অন্যতম কারণসমূহ হল কর ফাঁকি এবং মূসক আত্মসাৎ, কর-জিডিপি বৃদ্ধি করতে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য না থাকা, কর আত্মসাৎ বা ফাঁকির জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান না থাকা বা শাস্তি না হওয়ায় অপ্রতিরোধ্য/বিনা বাধায় কালো টাকা উপার্জনের সুযোগ, কর আদায়কারী এবং সম্ভাব্য কর প্রদানকরারীর মধ্যে অবৈধ সংযোগ, অটোমেশন না থাকা, কর প্রদানে জটিলতা, হয়রানির ভয়, কর অবকাশ সুবিধার অপব্যবহার, জটিল কর আইন এবং দুর্নীতির সুযোগ, প্রত্যক্ষ কর ও কৃষি খাত হতে কম কর সংগ্রহ, নাগরিকের ওপর উচ্চ কর-ভার, উৎস করের আওতায় কম সংখ্যক পণ্য, কর সংগ্রহকারীদের অপ্রতুল সুযোগ সুবিধা, কর না দেওয়ার সংস্কৃতি, সুশাসনে দুর্বলতা, পর্যাপ্ত জনবল না থাকা এবং সর্বোপরি নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার অভাব।

উপরোক্ত সমস্যার কারণে নিম্ন কর-রাজস্ব ফাঁদ তৈরি হয়। ফলশ্রুতিতে, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা, বিদেশি তহবিলের অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অধিক আগ্রহ, উন্নয়ন কাজে নিজস্ব অর্থায়ন বাড়ানোর ক্ষেত্রে কম গুরুত্বারোপ প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। তাই স্থানীয় পর্যায়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকলেও অটোমেশনের জন্য বিদেশি সহায়তা প্রত্যাশা করা যায় না। এছাড়াও এনবিআরের সীমিত ক্ষমতা, এনবিআরের চেয়ারম্যান পদে ঘন ঘন পরিবর্তন, এনবিআরের নিজস্ব নীতি ও কর ফাঁকি বা আত্মসাৎ রোধে নীতিমালা তৈরিতে সীমিত ক্ষমতা, পরোক্ষ করের ওপর নির্ভরতা, উচ্চ কর ভার অন্যতম।

### কর ফাঁকি বা আত্মসাৎ পদ্ধতি

এ গবেষণায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরে বাংলাদেশে প্রাক্কলন করা হয় কমপক্ষে কর ফাঁকি বা আত্মসাতের পরিমাণ প্রায় ২০,৯৮৩.৫ কোটি টাকা। কর ফাঁকি বা আত্মসাত বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে। যেমন, বেতনভুক্ত করদাতা অবৈধভাবে আয় করা সরকারি কর্মকর্তা এখনো করের বাইরে আছে। কিছু বেসরকারি চাকুরীজীবী ও ব্যবসায়ী প্রকৃত আয় গোপন করে, যারা অতিরিক্ত আয় করে কিন্তু বেতন করমুক্ত আয়/ব্যয় খাতে (মেডিক্যাল/জ্বালানি/ভ্রমণ) দেখায়, পেশাজীবিরা যেমন কর্পোরেট মালিকরা কম মুনাফা এবং করমুক্ত খাতে উচ্চ বিনিয়োগ প্রদর্শন; কর স্বর্গ বলে পরিচিত দেশে অর্থ পাঁচার, অন্যের নামে সম্পদ ক্রয় এবং বিদেশে ব্যবসায় মুলধন বিনিয়োগ, সামজিক ও করমুক্ত সেবায় অর্থ ব্যয়, রোগীদের ডাক্তার কর্তৃক রশিদ না দেয়া, ব্যক্তিগত রোগীর সংখ্যা কম প্রদর্শন, ফার্মাসিটিক্যালস কোম্পানির কাছ থেকে অর্থ বা উপহার নেয়া। এছাড়াও, কোন কোন আইনজীবী এবং আইন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক অর্থ প্রদানের রশিদ না দেয়া, ফি'র ক্ষেত্রে কম পরিমাণ প্রদর্শন, কর ফাঁকি দিলে আইনের ধারার অপব্যবহার, শিল্পিদের আর্থিক চুক্তি গোপন করা; রশিদবিহীন ক্যাশ আদান প্রদান, বিদেশি শিল্পীদের প্রদত্ত প্রকৃত অর্থের পরিমাণ গোপন করা ইত্যাদি।

তাছাড়াও, প্লট ক্রয়, ফ্ল্যাট, সঞ্চয় পত্র এবং অন্যান্য বস্ত আত্মীয় স্বজনদের নামে ক্রয়, করযুক্ত আয় গোপন করার জন্য সম্পদ ক্রয় ও নির্মাণে ঋণ, ভুয়া ভাউচার এবং অর্থ প্রদানের তথ্য সংরক্ষণ, করযুক্ত মুনাফা পরিবর্তন করার জন্য মৎস্য, পোলট্রি, এবং কৃষি-ভিত্তিক শিল্পের ন্যায় করমুক্ত খাতে ব্যয় দেখায়। 'কর ছাড় সুবিধা গ্রহণ, ২০% লভ্যাংশ ঘোষণা, আইটি সংশ্লিষ্ট সেবা ও ব্যবসায় ভুয়া বিনিয়োগ। রেষ্টুরেন্ট, হোটেল, কমিউনিটি সেন্টার কমসংখ্যক অতিথি এবং ফি এবং চার্জ এর তথ্য প্রদান করে। অডিটর, সিএ ফার্ম তাদের নিজস্ব আয় গোপন করে এবং করদাতাদের কর ফাঁকিতেও সহায়তা করে।

### নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অনিয়ম

এই গবেষণায় এনবিআর এর কর রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত গাড়ি বিক্রি, আয় গোপন করে কর ফাঁকি, ব্যক্তিগত কর রিটার্ন ফরম অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করা, কোন স্বার্থান্বেষী মহলের পক্ষে কর হার নির্ধারণে হস্তক্ষেপ করা এবং তাদের পক্ষে আইন প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করা অন্যতম।

### আইনি দুর্বলতা এবং বিচারিক প্রক্রিয়া

এনবিআরের জন্য বর্তমানে আয়কর, মূসক এবং শুল্ক আইন, এসআরও রয়েছে। অনুসন্ধান করে বিভিন্ন আইনি কাগজপত্র এবং প্রক্রিয়ায় অনেক অনিয়মের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। প্রধান সমস্যা ঘন ঘন আইন ও নীতিমালা পরিবর্তন, আইনের ভাষাগত জটিলতা, এসআরও, শুল্ক আইনে অনিরাপদ অথবা ভেজাল খাদ্যপণ্য আমদানিতে সুরক্ষাহীনতা, কায়িক এবং আর্থিক শাস্তির ক্ষেত্রে অসম কর আইন, অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে দুর্নীতির চর্চা এবং সময় সাপেক্ষ পণ্য ছাড়, আইনি ও সময়-সীমা নির্ধারক সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা, বিচারিক প্রক্রিয়ায় নিরপেক্ষতার ঘাটতি এবং নতুন ও পুরাতন শিডিউলের মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা, আইনি জ্ঞানের অভাব পুরো বিচারিক প্রক্রিয়াকে অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নসাপেক্ষ করে তোলে।

### বিতর্কিত সংস্কার কার্যক্রম বা অটোমেশনের কার্যকারিতা

এ গবেষণায় বিদেশি সাহায্য নির্ভর সংস্কার কার্যক্রমে অস্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া, বিদেশি অনুদান-নির্ভর বিভিন্ন প্রকল্প টেকসই বা কার্যকরী না হওয়া, স্থানীয় চাহিদা নির্ভর না হওয়া, এনবিআর-এর নিজস্ব কর্মকর্তাদের দক্ষতা অর্জনকে গুরুত্ব না দিয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা, দেশি অভিজ্ঞ ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও উচ্চমূল্যে বিদেশি পরামর্শক নিয়োগ এবং সর্বোপরি স্থানীয় প্রযুক্তিকে অবহেলা করে বিদেশি দামি সফটওয়ার ক্রয় অন্যতম।

### কর সংগ্রহে চ্যালেঞ্জ

### মানবসম্পদ বিভাগের দুর্বলতা এবং জবাবদিহিতা

এনবিআর দক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত কর প্রশাসন নিশ্চিত করতে পারছে না। কেননা এনবিআরের কর রাজস্ব সংগ্রহ ১৯৯০ সালের তুলনায় ২০০৮ সালে ৮গুণ বৃদ্ধি পেলেও এতে ১৯৮৪ সালের কর্মীবৃন্দ নিয়োজিত রয়েছে। এনবিআরের কর সংগ্রহকারীদের জবাবদিহিতা ও সততার ঘাটতি, আইন মেনে পুরস্কার ও তিরস্কার কার্যক্রম গ্রহণ না করা, আইন ভঙ্গ করে কর কর্মকর্তাদের পুরস্কার প্রদান, কর্মকর্তাদের একচ্ছত্র ক্ষমতার অপব্যবহার, এমআইএসের অনুপস্থিতি, সর্বস্তরে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত না করা, অদক্ষতা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ছাড়া বা সংশ্লিষ্ট নয় এমন লোক নিয়োগ প্রদান অন্যতম সমস্যা।

### কর সংগ্রহ কার্যক্রম

অকার্যকর কর পরিদর্শন পরিদপ্তর কার্যক্রম, অটোমেশন চালু করতে স্টাফদের অসহযোগিতা, নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দের আইন-কানুন ও নীতিগুলো সম্বন্ধে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকা, এনবিআরের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, সম্পদ স্বল্পতা, দুর্বল তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি অন্যতম চ্যালেঞ্জসমূহ। অধিকন্তু, আয়কর এবং মূসক রেজিস্ট্রেশন, কর অ্যাসেসমেন্ট, শুল্ক মূল্য ভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে যোগ্য কর্মীর ঘাটতি, আমদানি মূল্য ও পণ্যের ধরন বিষয়ে অপর্যাপ্ত ও ভুল তথ্য কর সংগ্রাহক, নীতি নির্ধারক এবং সুবিধাভোগী ব্যবসায়ীদের দুর্নীতি, স্থলবন্দরের অবকাঠামোগত সমস্যা এবং পিএসআই কোম্পানির দুর্নীতি অন্যতম সমস্যা।

মূসক প্রদান পদ্ধতিতে বিভিন্ন সমস্যা যেমন, অটোমেশন এবং ম্যানুয়েল প্রক্রিয়ার অভাব, মূসক ডিপোজিট এবং কর সংগ্রাহক বা ইন্সপেক্টরদের সাথে যোগসাজশে কর ফাঁকি, সম্ভাব্য ভ্যাট রাজস্ব সংগ্রহে ভ্যাট প্রদানকারীদের হয়রানি, মূসক সংগ্রহে ফাঁকি, সময়সাপেক্ষ ভ্যাট নিরীক্ষা এবং নিরীক্ষা বিশেষজ্ঞদের অনুপস্থিতির কারণে কাঙ্ক্ষিত মূসক সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না।

দুর্বল প্রশিক্ষণ ও জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে বিলম্ব, প্রতারণা চিহ্নিত করতে না পারা অথবা বিক্রিত অর্থের পরিমাণ গোপন রাখা, রেকর্ডবিহীন বিনিময়, অধিকাংশ এনজিও (৬৬%) এর মূসক ফাঁকি, দুর্বল পরীবিক্ষণ, রশিদবিহীন এবং ইসিআর হতে বিভিন্ন মূল্যের রশিদ প্রদান অন্যতম সমস্যা।

### কর না দেয়ার প্রবণতার কারণসমূহ

বর্তমানে বিদ্যমান টিআইএনধারীদের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে কম সংখ্যক কর প্রদান করছে এবং বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর ১.৮ শতাংশ টিআইএনধারী। এর প্রধান কারণসমূহ হল ১. কাঙ্ক্ষিত নাগরিক সুবিধা না পাওয়া; ২.প্রদত্ত কর সঠিকভাবে ব্যবহারে সরকারের ওপর আস্থার ঘাটতি; ৩.জটিল কর সংগ্রহ ব্যবস্থা এবং কর সংগ্রহকারীর সাথে সম্ভাব্য করদাতার যোগসাজশ; ৪.কর ফাঁকি বা আত্মসাতের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত না করা; ৫. অটোমেশন এবং ই-গভর্নেন্সের অভাব; ৬.কর প্রদানে জাতীয় সংস্কৃতি ও সুশাসনের অভাব; ৭.বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়হীনতা অন্যতম।

দুর্নীতি এবং হয়রানিমুক্ত কর কার্যক্রম নিশ্চিত করাই প্রধান অন্তরায়। যোগ্য এবং সৎ কর সংগ্রহকারীদের মাধ্যমে আধুনিক ও করবান্ধব

পরিবেশ তৈরি হলে রাজস্ব সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আসবে। সঠিক কর প্রদান এবং প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামোর জন্য পেশাদারী সংস্থার সাথে চুক্তি করতে এনবিআর এখন পর্যন্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

### কর সংক্রান্ত সেবার মান

আয়কর অ্যাসেসমেন্ট এ করদাতাদের হয়রানি এবং অনিয়ম সমস্যা। পাশাপাশি, করদাতারা অতিরিক্ত কর ধার্য, অ্যাসেসমেন্টে বিলম্ব, বিভিন্ন কাগজপত্র জমা দিতে চাপ প্রদান, অভিযোগের সুরাহা না হওয়া, সার্বজনীন সেলফ অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে অডিটের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্ধারণ না করা এবং কর ফাঁকি এবং ঘুষ ও হয়রানির দৌরাত্ম্য কর প্রশাসন গতিশীল করার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা।

অধিকন্তু, কর সংক্রান্ত অভিযোগ এবং সমস্যাসমূহ সমাধানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সমস্যা, হাইকোর্টে আপিল আদালতে জবাবদিহিতার ঘাটতি, ন্যায়বিচারের অভাব, করদাতাদের দীর্ঘ সময়েও রায় না পাওয়া প্রভৃতি বিদ্যমান। ফলে করদাতারা ভোগান্তির সম্মুখীন হচ্ছে এবং সরকারও কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব হতে বঞ্চিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, এ গবেষণায় সুষ্ঠু বিচারিক প্রক্রিয়া নিশ্চিতকরণে আইন বিশেষজ্ঞদের অপর্যাপ্ততা, সম্পদের অপচয় এবং হয়রানির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

### নাগরিক সনদে সমস্যা

এনবিআরের সিটিজেন চার্টার প্রয়োগে সমস্যা রয়েছে। সিটিজেন চার্টার ফাইনাল করার আগে জনগণের অংশগ্রহণ হয়নি; করদাতা চার্টার সম্পর্কে অবগত নয়, এটিতে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। সিটিজেন চার্টারের বিষয়াবলীতে ভিশন এবং মিশন, সেবা গ্রহীতাদের বর্ণনা, সেবার মান উন্নয়নে মূল্যায়ন ও পদক্ষেপ এবং তৈরির সময় না থাকা।

### বিলুপ্ত সাংবিধানিক কর ন্যায়পালের কার্যক্রম

বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে 'কর ন্যায়পাল আইন (রহিতকরণ) বিল ২০১১' সংসদে পাস করেছে। কিন্তু,বিদ্যমান আইনের যথাযথ সংস্কার ব্যতিরেকেই প্রথম কর- ন্যায়পালের পদ বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্তটি সুবিবেচনাপ্রসূত নয়। অন্যদিকে কর-ন্যায়পাল আইনের ৩৫ নং ধারায় বিকল্প বিরোধ নিরসনের বিষয়ের উল্লেখ থাকায় কর-ন্যায়পাল আইন বিলুপ্ত করে এ সংক্রান্ত ভিন্ন আইন তৈরির উদ্যোগ যৌক্তিক নয়। গবেষণায় দেখা যায়, কর ন্যায়পালের সীমাবদ্ধতা যেমন, সরকারি কর্মকর্তাদের কর ন্যায়পালের আওতা বহির্ভূত রাখা, প্রয়োজনীয় বাজেট নির্ধারণ ও মানবসম্পদ বরাদ্দের স্বাধীনতা/ক্ষমতা না থাকা, কর-ন্যায়পাল কার্যালয়ের জন্য ২০০৯-১০ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত ১.২৫ কোটি টাকা কর-প্রদানকারীদের স্বার্থের তুলনায় মোটেই অতিরিক্ত নয়। একতরফাভাবে কর-ন্যায়পাল পদের বিলুপ্তির প্রশাসনিক উদ্যোগ কর-ব্যবস্থায় দুর্নীতি প্রতিরোধ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দুর্নীতি ও অনিয়মকে উৎসাহিত করবে। এ আইন বাতিল হলে করদাতাদের হয়রানি বন্ধে একটি হারানো সুযোগ বলে প্রতীয়মান হবে।

উল্লেখ্য, তথ্যে টিআইবি কিছু সুপারিশ ও পরামর্শ এবং নীতিনির্ধারনী দুটি বাজেটে ২০০৮-২০০৯ এবং ২০০৯-২০১০ পর্যবেক্ষণ করা হল। অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট তথ্যের[১০১] আলোকে এনবিআরের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনতে যেসব প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল তা কতটুকু প্রতিফলন হয়েছিল তা নিম্নে আলোকপাত করা হল:

**সারণি ১০: বাজেটের ওপর টিআইবি প্রস্তাবের প্রতিফলন**

| অর্থ বছর | প্রস্তাব | গৃহীত পদক্ষেপ/প্রস্তাবসমূহ |
|---|---|---|
| ২০০৮-২০০৯ | বিচার প্রক্রিয়ায় বিচারক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় এবং দ্রুত বিচার আদালত গঠন | অর্থমন্ত্রী কর্তৃক ইতোমধ্যে দ্রুত বিচার এবং কেস বা বিবাদ মীমাংসার জন্য জাতীয় কর ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা |
| | গবেষণা বিভাগকে এনবিআর-এর একটি বিশেষ বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং মেধাবী ও দক্ষ ব্যক্তিদের উচ্চ পদ ও বেতনে নিয়োগ প্রদান (অর্থবছর : ২০০৮-০৯) | ২০০৯-১০ অর্থবছরে Tax Information Management and Research Center প্রতিষ্ঠার ঘোষণা |
| | এইচ.এস. কোড-এ পণ্যের সংজ্ঞা স্বচ্ছ ও সময়োপযোগী হওয়া উচিত (অর্থবছর : ২০০৮-০৯) | পণ্যের তালিকায় স্বচ্ছতা আনয়ন এবং এইচ এস কোড পৃথক করা বা নতুন কোড সৃষ্টির বিষয়ে কিছু সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শুল্ক আইন, ১৯৬৯ সালের প্রথম সিডিউল সংশোধন করা হয়েছে (অর্থবছর ২০০৯-১০) |
| | স্থানীয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রচলন এবং শূন্যপদে অতিসত্ত্বর ইন্সপেক্টর ও সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিয়ুক্তকরণ | কর বিভাগে সদস্যপদ, এলাকা এবং আপিল জোন বৃদ্ধি করা; ইতোমধ্যে ১০৪ জন ইন্সপেক্টর নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন এবং মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে কর্মরত শুল্ক ও মূসক কর্মকর্তা এবং স্টাফ সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ |

[১০১] http://www.mof.gov.bd/en/budget/09_10/speech

| অর্থ বছর | প্রস্তাব | গৃহীত পদক্ষেপ/প্রস্তাবসমূহ |
|---|---|---|
| ২০০৯-২০১০ | কর ফাঁকির ক্ষেত্রে দায়ী ব্যক্তিকে দ্বিগুণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিতকরণ | বর্তমানে মূসক এবং সম্পূরক শুল্ক ফাঁকির জন্য শাস্তি কমপক্ষে ২৫% এবং সর্বোচ্চ ৭৫% পরিবর্তন করে কমপক্ষে সমপরিমাণ অর্থ এবং সর্বোচ্চ ফাঁকি দেওয়া অর্থের আড়াইগুণ করা হয়েছে |
| | ইউএনও অফিসের সাথে সম্মিলিতভাবে উপজেলা পর্যায়ে রাজস্ব সংগ্রহ উইন্ডো স্থাপন। করদাতাদের অধিক আয়ের উৎস অনুসন্ধানের বিধি প্রতিষ্ঠা | প্রত্যেক উপজেলায় ছোট আকারের মূসক ইউনিট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ। এ লক্ষ্যে ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও সিলেটের বিভিন্ন এলাকা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্রে জরিপ চালনা হয়েছে; |
| | আয়কর জমাপ্রদান ব্যবস্থার পূর্ণ যান্ত্রিকীকরণ এবং ই-গভর্নেন্স | সীমিত আকারে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন ফরম জমা এবং মূসক রেজিস্ট্রেশন এবং জমাদান চালু করা হয়েছে। নতুন ক্ষুদ্র করদাতাদের জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে আয় এবং প্রদানের দ্রুত পরিমাপ, দুই পাতার সহজ কর প্রদান ফরম তৈরি |
| | টি আই এন, এন আই ডি এবং রিপোর্টের জন্য সমন্বিত আইডি/কোড বিধি | ভুয়া টি আই এন বা একই ব্যক্তির একাধিক টি আই এন প্রতিরোধে টি আই এন এ এন আই ডি নম্বর প্রদান |

গবেষণালব্ধ এ তথ্যসমূহের আলোকে নিম্নের সুপারিশসমূহ প্রদান করা হয়েছে।

## সুপারিশ

### ক. জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ

১. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আইন প্রণয়ন, এর সকল স্তরে কর্মী নিয়োগ, কর সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে;

২. সরকারকে নীতি নির্ধারকবৃন্দ এবং এনবিআর কর্মকর্তাদের সম্পদের হিসাব নিয়মিত প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে;

৩. দুর্নীতি রোধ ও সামাজিক সাম্য নিশ্চিত করতে কালো বা অপ্রদর্শিত অর্থ সাদা করার বিধান সম্পূর্ণরূপে বিলোপ বা বন্ধ করতে হবে;

৪. স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কর কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এনবিআরের দীর্ঘস্থায়ী সংস্কার সাধন করতে হবে;

৫. কর-ন্যায়পাল পদ বিলুপ্ত না করে পুনঃনিয়োগ প্রদান এবং বিদ্যমান আইন সংস্কারের মাধ্যমে কর ন্যায়পালকে-

   ক) পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান;

   খ) পর্যাপ্ত সম্পদ প্রদান;

   গ) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিচারের আওতায় নিয়ে আসা; এবং

   ঘ) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থার বিধান নিশ্চিত করতে হবে।

৬. কর প্রদানের সকল ক্ষেত্রে অটোমেশন অবশ্যই কর-বান্ধব, স্থায়ী, দক্ষ, নির্ভরযোগ্য[১০২] এবং তার দ্রুত চালু করতে হবে;

৭. কর কর্মীদের কাজে গতিশীলতা আনতে এর মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, এনবিআরের জন্য বরাদ্দ এবং তার ব্যবহার সম্পর্কে খুব দ্রুত পর্যালোচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

### খ. আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

৮. স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণ, একচ্ছত্র ক্ষমতার অবাধ চর্চা এবং বৈশ্বিক মূল্যায়ন নীতিমালার আলোকে খসড়া কর আইন (আয়কর, মূসক এবং শুল্ক) সমূহের পরিবর্তন, কর নীতি প্রণয়ন ও এনবিআরের কার্যক্রম, একচ্ছত্র ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিফলন থাকতে হবে;

৯. স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে খসড়া এস.আর.ও. কে আইনে রূপ দেয়ার পূর্বে মতামত গ্রহণের জন্য জনসমক্ষে প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে;

১০. এনবিআরের বাজেট বা অন্যান্য বিষয়ে চলমান মতামত গ্রহণ পদ্ধতিকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে সুশীল সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১১. আপিল পদ্ধতিকে দ্রুততর এবং জবাবদিহিমূলক করতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের, যার মধ্যে এনবিআরের বাইরে থেকে কমপক্ষে ৫০%, নিয়োগ করতে হবে।

১২. এনবিআরের গবেষণা বিভাগকে আলাদা আইনি সত্তা হিসাবে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা এবং পর্যাপ্ত সম্মানি ও সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এখানে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে হবে।

[১০২] User-friendly, Sustainable, Efficient and Reliable (USER)

গ. দুর্নীতি ও অনিয়ম হ্রাস

১৩. এনবিআরে দুর্নীতির চর্চা, কর ফাঁকি/আত্মসাতের বিরুদ্ধে 'কোন প্রকার সহনশীলতা প্রদর্শন না করে' সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

১৪. পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকৃত কর কর্মীদের নির্বাচন এবং একই সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞদের মাধ্যমে কর কর্মীদের কর আইন, হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার ওপর ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫. একচ্ছত্র ক্ষমতার মর্জিমাফিক ব্যবহার, কর ফাঁকি বা আত্মসাতের সাথে কর সংগ্রহকারীদের সংশ্লিষ্টতা এবং অডিট রিপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রে অনৈতিক কার্যক্রম রোধে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনা নিশ্চিতের মাধ্যমে আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে।

১৬. কর ফাঁকি, আয় গোপন এবং অর্থ পাচার রোধে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে-

- একক পরিচয়পত্র বা টিআইএন, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং পাসপোর্টের নম্বর প্রদান করতে হবে;
- একটি সীমা পর্যন্ত সকল আর্থিক লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে করার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা প্রদান করা;
- দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত ব্যাংক হিসাবের নিয়মিত নিরীক্ষা (tracking) করা;
- সকল বৈধ টিআইএনধারীদের তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করা;
- কর প্রণোদনার (incentive) অর্থনৈতিক প্রভাব পর্যালোচনা করা;

১৭. হয়রানি রোধে এবং করদাতা-বান্ধব কর সংগ্রহ পদ্ধতি নিশ্চিতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে-

- দাখিলকৃত অভিযোগ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা;
- কর প্রদান প্রক্রিয়ার সকল ক্ষেত্রে ওয়ানস্টপ সেবা চালু করা এবং করদাতা রেজিস্ট্রেশন এবং কর প্রদানের কার্যক্রম আউটসোর্সিং করা;
- করাদাতা এবং কর কর্মীদের মধ্যে নিয়মিত সভার ব্যবস্থা করা;
- ব্যক্তি এবং কর্পোরেট করদাতাদের জন্য পৃথক রিটার্ন ফরম চালু করা;
- আয়কর হার (ব্যক্তি এবং কর্পোরেট উভয়) এবং আয়স্তর পুনঃনির্ধারণ করা।

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহে কর রাজস্ব বৃদ্ধি এবং কর ব্যবস্থাকে পুরোপুরি কার্যকর করতে নীতি নির্ধারক শ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সব স্তরের অনৈতিক ও অনিয়ম বন্ধ করে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। কর আদায় প্রক্রিয়া সহজ করা এবং কর ফাঁকি রোধ করার জন্য আইনগুলো নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে। এনবিআরের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে নীতি নির্ধারক শ্রেণীর রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সততার বিকল্প নেই।

## তথ্যসূত্র


আলম এম. শাহ, "Broadening the Jurisprudential basis of Human rights to fight Corruption: Domestic and International Perspectives", Journal of Human Rights and Corruption, Page 7

আহমেদ জে.,"Challenging Corruption: Professional Accountants at the Crossroad", বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থাপিত পেপার, ১২-১৫ ডিসেম্বর, ২০০৭

আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪

ইফতেখারুজ্জামান, 'Ombudsman for Good Governance in Bangladesh: Why Now, and How? ", ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন যৌথভাবে আয়োজিত সেমিনার, ঢাকা, ১৫ মে, ২০০৭

ইউসুফ এম আব্দুলাহ, চেয়ারম্যান, সেন্ট্রাল বোর্ড অব রেভিনিউ, পাকিস্তান কর প্রশাসন প্রক্রিয়ায় সংস্কার, ১৭ তম কর সম্মেলন, ৮-১১ অক্টোবর, ২০০৭, টোকিও, জাপান

এটলাস, এস.এইচ., (১৯৮০), The Sociology of Corruption, বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ভলিউম ১০, পৃষ্ঠা ২৯১-২৯৩, ২০০৩

ওড-হেইজ, "*Revenue administration and corruption*", U4 ইস্যু ২:২০০৫; www.U4.no

কবহাম, এলেক্স, " The tax consensus has failed, The Oxford Council on Good Governance, ২০০৭-০১

কামাল আলি (২০০২), "Underground Economy and Tax Evasion in Pakistan: A Critical Evaluation", গবেষণা রিপোর্ট নং ১৮৪, পাকিস্তান ইনষ্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকনোমিক্স, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান

কর ন্যয়পাল আইন ২০০৫

খান আরিফ এইচ. "নাগরিক সনদ কি, কেন এবং কিভাবে", মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ঢাকা, জানুয়ারি ২০০৯

চন্দ্রচুদ অভিনাভ, "How legitimate is non-arbitrariness? Constitutional invalidation in the light of Mardia Chemicals v. Union of India", Indian J. Const. L., পৃ.১৭৯-১৯০, পৃ. ১৮৮

চৌধুরী জসিম আলী, "*Legal implications of whitening black money*", Law and Our Rights Magazine, ইস্যু নং ৪, দ্য ডেইলী স্টার, ৪ জুলাই, ২০০৯

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অর্ডার, ১৯৭২ প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার নম্বর ৭৬

জে.এডগারডো কম্পাস, প্রধান সঞ্জয়, "*The Many faces of Corruption: Tracking Vulnerabilities at the Sector Level* ", সম্পাদিত, পৃ.৩৩৬, বিশ্বব্যাংক, ওয়াশিংটন, ২০০৬

দ্য ডেইলি স্টার, ২৯ আগস্ট ২০০৮

দৈনিক ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮

দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কনভেনশন ২০০৫

দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ ২০১০, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৮

হাসান, এম.কবির, " The Shadow Economy of Bangladesh: Size Estimation and Policy Implications ", ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১০

হক আনিসুল, " খুন করুন এবং চলে আসুন", দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ জুন, ২০০৯

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৭, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা

বাৎসরিক প্রতিবেদন ২০০৬-০৭, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ, ২০০৮, ঢাকা

বিশ্ব ব্যাংক BEI Report, Improving the investment climate in Bangladesh, 2003

মাউরু পি., "Corruption: Causes, Consequences, and Agenda for Further Research," Finance and Development, আইএমএফ, মার্চ ১১-১৪, ১৯৯৮

মিঠুন এ.এ., "বিদেশি সাহায্য হস্তান্তরে দুর্নীতি", এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, বাংলাদেশ সরকার, ডিসেম্বর ২০০৮

মুজাফফর টি., ২০০৯, ডায়গনস্টিক গবেষণা " বাংলাদেশের তৈরি পোষাক শিল্প", অপ্রকাশিত প্রতিবেদন, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (অপ্রকাশিত গবেষণা)

লুইস হেনকিন,"The Age of Rights, 1990", রাজকুমার লিখিত, "Corruption and Human Rights-II", Frontline, ভলিউম ১৯, ইস্যু নং ২০, অক্টোবর, ১২-২৫, ২০০২

রউজ-একেরম্যান, সুসান (১৯৯৭), "Corruption and Development", উন্নয়ন অর্থনীতি বিষয়ক বার্ষিক বিশ্বব্যাংক সম্মেলন, ১৯৯৭
রউজ, মাইকেল, এল, Does Taxation Lead to Representation?, UCLA রাষ্ট্রবিজ্ঞান ডিপার্টমেন্ট, জানুয়ারী, ২০০৭
রাজস্ব সংস্কার কমিশন রিপোর্ট, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ২০০৩
Sharma, Chanchal Kumar 2005, Implementing VAT in India: Implications for Federal Polity, Indian Journal of Political Science, LXVI (4): 915-934
Smith A, "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations", 1993, p.450
Schneider Friedrich, Buehn Andreas and Montenegro Claudio E., 2008, Shadow Economies all over the World: New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007, World Bank cegional report on the informal sector in Central, Southern Europe and the Baltic countries (Task number P112988), Washington, USA
মাহমুদ তানভীর, রোসেটি জুলিয়েট টি, ২১ জুন ২০০৮, "চট্টগ্রাম শুল্ক হাউজের ওপর পরিচালিত ডায়াগনস্টিক গবেষণা", টিআইবি, ঢাকা
The Governance Working Group of the International Institute of Administrative Sciences, 1996
ডেইলি স্টার, ৩ জুলাই ২০০৯
বাংলাদেশের সংবিধান ধারা ৭৭
মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো ২০১০-১১ হতে ১০১২-১৩, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা, ১৩
http://www.mof.gov.bd/en/budget/10_11/mtbf/bn/MTBS_Chap%203_Bang.pdf

**ওয়েবসাইটসমূহ:**

http://www.amadershomoy.com/content/2009/06/08/news0827.htm
http://www.bangladesh-web.com/view.php?hidRecord=174613
http://www.bdlaws.gov.bd/sections_detail.php?id=401&sections_id=23855
http://cvc.nic.in/vscvc/cvcspeeches/sp5nov01.pdf
http://cvc.nic.in/vscvc/cvcspeeches/sp5nov01.pdf, page 2
http://en.wikipedia.org/wiki/VAT#VAT_Rates
http://www.globalintegrity.org/documents/Global%20Integrity%20Index%202007.xls
http://en.wikipedia.org/wiki/Tax
http://www.gdrc.org/u-gov/governance-define.html
http://www.javno.com/en/croatia/clanak.php?id=233847
http://www.u4.no/document/literature/u4_issue2_2005_revenue_administration.pdf
http://www.mof.gov.bd/en/budget/09_10/mtbf/en/Chapter_V.pdf
http://www.polisci.ucla.edu/faculty/ross/taxrep.pdf(Retrieved on 2007-09-30)
http://www.prothom-alo.com/index.news.details.php?nid=MTk5NzY
http://www.ti-bangladesh.org/Ombudsman150507.pdf
www.nbr-bd.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Tax#Transparency_and_simplicity
http://www.thedailystar.net/law/2009/07/01/index.htm
http://www.mof.gov.bd/mof2/budget/07_08/mtbf/4.pdf
http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/Star-rep-full.pdf
http://www.taxjustice.net/cms/front_content.php?idcat=2

# পরিশিষ্ট

**পরিশিষ্ট ১: সার্বিক কর রাজস্বে এনবিআরের অবদান**

| অর্থবছর | চলতি মূল্যে জিডিপি (কোটি টাকা) | সার্বিক রজস্বা সংগ্রহ (কোটি টাকা) | সার্বিক কর রাজস্ব (কোটি টাকা) | এনবিআর সংগৃহীত কর (কোটি টাকা) | রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত | কর রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত | এনবিআর কর রাহস্ব-জিডিপি অনুপাত | কর রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৭২-৭৩ | ৪৯৮৫.৩ | ১৭১.২৩ | ১৬৯.৮ | ১৬৬.৩ | ৩.৪৩% | ৩.৪১ | ৩.৩৪ | ৩.৪১ |
| ১৯৭৩-৭৪ | ৭৫৭৫.২ | ২৯২.২৯ | ২৮৮.৮৯ | ২৭৮.০৮ | ৩.৮৬% | ৩.৮১ | ৩.৬৭ | ৩.৮১ |
| ১৯৭৪-৭৫ | ১২৪৩৬.৯ | ৫০৫.৪৬ | ৪৩০.৪৯ | ৪১০.২৯ | ৪.০৬% | ৩.৪৬ | ৩.৩ | ৩.৪৬ |
| ১৯৭৫-৭৬ | ১১০৩২.০ | ৮৪৮.২৬ | ৭১৩.৩৯ | ৬৭৩.৬৩ | ৭.৬৯% | ৬.৪৭ | ৬.১১ | ৬.৪৭ |
| ১৯৭৬-৭৭ | ১১৬০০.৩ | ৯২৩.০৮ | ৭৭০.২৩ | ৭২৬.০৭ | ৭.৯৬% | ৬.৬৪ | ৬.২৬ | ৬.৬৪ |
| ১৯৭৭-৭৮ | ১৪৫১৯.৪ | ১১৫২.৯৪ | ৯৯৮.২১ | ৯৩৯.৬৬ | ৭.৯৪% | ৬.৮৮ | ৬.৪৭ | ৬.৮৮ |
| ১৯৭৮-৭৯ | ১৭৪০৪.৭ | ১৪১৮.৮১ | ১২১৬.৫৮ | ১১৪৬.৭৮ | ৮.১৫% | ৬.৯৯ | ৬.৫৯ | ৬.৯৯ |
| ১৯৭৯-৮০ | ২৮০৭৭.৭ | ১৬৯৫.৪১ | ১৪৫৮.৭৯ | ১৩৭৮.১৪ | ৬.০৪% | ৫.২০ | ৪.৯১ | ৫.২০ |
| ১৯৮০-৮১ | ৩২২১৩.৬ | ২২৯৫.৪৫ | ১৮৩১.৪৪ | ১৭২২.৭৯ | ৭.১৩% | ৫.৬৯ | ৫.৩৫ | ৫.৬৯ |
| ১৯৮১-৮২ | ৩৬১৭৪.০ | ২৩৪৫.৪৩ | ১৯৭৮.৫৩ | ১৮৫৩.৫৪ | ৬.৪৮% | ৫.৪৭ | ৫.১২ | ৫.৪৭ |
| ১৯৮২-৮৩ | ৪০৮৩০.৮ | ২৪৭০.৬৫ | ২১৩৪.২৪ | ১৯৯৯.৭২ | ৬.০৫% | ৫.২৩ | ৪.৯ | ৫.২৩ |
| ১৯৮৩-৮৪ | ৪৮৯৭৮.৭ | ২৭৭৯.৫৭ | ২৩৭২.৪৯ | ২২৩১.২৯ | ৫.৭০% | ৪.৮৪ | ৪.৫৬ | ৪.৮৪ |
| ১৯৮৪-৮৫ | ৫৬১৯৪.৪ | ৩৫৭৬.৩৮ | ২৯৬৭.২২ | ২৭২৪.৩৮ | ৬.৩৬% | ৫.২৮ | ৪.৮৫ | ৫.২৮ |
| ১৯৮৫-৮৬ | ৬৩২৬৯.১ | ৪০৮৩.১১ | ৩৩০২.৯৭ | ৩০৫৪.১৩ | ৬.৪৫% | ৫.২২ | ৪.৮৩ | ৫.২২ |
| ১৯৮৬-৮৭ | ৭২৭৭১.১ | ৪৬৮৫.২ | ৩৮৬৬.২ | ৩৫৭৬.২ | ৬.৪৪% | ৫.৩১ | ৪.৯১ | ৫.৩১ |
| ১৯৮৭-৮৮ | ৭৯৯৯২.৯ | ৫২০২.৭১ | ৪৪২৩.৭১ | ৪০৬৮.৭১ | ৬.৫০% | ৫.৫৩ | ৫.০৯ | ৫.৫৩ |
| ১৯৮৮-৮৯ | ৮৯০৫৯.৮ | ৫৭৭১.৯৭ | ৪৮৪৫.৪৯ | ৪৪৯০.৯৯ | ৬.৪৮% | ৫.৪৪ | ৫.০৪ | ৫.৪৪ |
| ১৯৮৯-৯০ | ১০০৩২৮.৮ | ৬৭১১.৮৭ | ৫৭১৫.০১ | ৫২৯২.০১ | ৬.৬৯% | ৫.৭০ | ৫.২৭ | ৫.৭০ |
| ১৯৯০-৯১ | ১১০৫১৮.১ | ৭৯৯৫.৩৫ | ৬৫৮৭.৩৫ | ৬১৫২.৩৫ | ৭.২৩% | ৫.৯৬ | ৫.৫৭ | ৫.৯৬ |
| ১৯৯১-৯২ | ১১৯৫৪২.৪ | ৯৮১৬.৭২ | ৭৯০০.৭২ | ৭৩৪৭.৭২ | ৮.২১% | ৬.৬১ | ৬.১৫ | ৬.৬১ |
| ১৯৯২-৯৩ | ১২৫৩৬৯.৫ | ১১৩২১.৯৮ | ৯২৫৪.৯৮ | ৮৫৩৭.৭৮ | ৯.০৩% | ৭.৩৮ | ৬.৮১ | ৭.৩৮ |
| ১৯৯৩-৯৪ | ১৩৫৪১২.৩ | ১২৩৮৮.৫৩ | ৯৭২৪.৭৪ | ৮৯৯৫.৫১ | ৯.১৫% | ৭.১৮ | ৬.৬৪ | ৭.১৮ |
| ১৯৯৪-৯৫ | ১৫২৫১৭.৮ | ১৪০৮৯.৫৩ | ১১৩৫৬.০৩ | ১০৫২২.৫৬ | ৯.২৪% | ৭.৪৫ | ৬.৯ | ৭.৪৫ |
| ১৯৯৫-৯৬ | ১৬৬৩২৪.০ | ১৫৪০৮.০৪ | ১২১৭৪.১ | ১১৩৭০.০৬ | ৯.২৬% | ৭.৩২ | ৬.৮৪ | ৭.৩২ |
| ১৯৯৬-৯৭ | ১৮০৭০১.৩ | ১৬৬৬৩.৯ | ১৩৪৫২.৯২ | ১২৫০৩.২৫ | ৯.২২% | ৭.৪৪ | ৬.৯২ | ৭.৪৪ |
| ১৯৯৭-৯৮ | ২০০১৭৬.৬ | ১৭৫৮৯.৭৫ | ১৪৭৯২.৮৩ | ১৩৮০১.৭৯ | ৮.৭৯% | ৭.৩৯ | ৬.৮৯ | ৭.৩৯ |
| ১৯৯৮-৯৯ | ২১৯৬৯৭.২ | ১৮৮০৫.৩৬ | ১৫৭৫০.২১ | ১৪৮৬৯.২৯ | ৮.৫৬% | ৭.১৭ | ৬.৭৭ | ৭.১৭ |
| ১৯৯৯-'০০ | ২৩৭০৮৫.৬ | ২১০২৯.৪১ | ১৬০৮১.৩৬ | ১৫১২৩.২৫ | ৮.৮৭% | ৬.৭৮ | ৬.৩৮ | ৬.৭৮ |
| ২০০০-০১ | ২৫৩৫৪৬.৪ | ২৩১৮০.৪৪ | ১৯৭৭৭.৪৪ | ১৮৭৭৪.৪৪ | ৯.১৪% | ৭.৮০ | ৭.৪ | ৭.৮০ |
| ২০০১-০২ | ২৭৩২০১.১ | ২৫৯০০.২১ | ২১৩১৫.২১ | ২০২০৭.২১ | ৯.৪৮% | ৭.৮০ | ৭.৪ | ৭.৮০ |
| ২০০২-০৩ | ৩০০৫৮০.০ | ৩০৮৭১.১২ | ২৪৭১৭.১২ | ২৩৬৫১.১২ | ১০.২৭% | ৮.২২ | ৭.৮৭ | ৮.২২ |
| ২০০৩-০৪ | ৩৩২৯৭৩.১ | ৩৩৯৪৩.৭৭ | ২৭৪৩০.৭৭ | ২৬১৯৩.৭৭ | ১০.১৯% | ৮.২৪ | ৭.৮৭ | ৮.২৪ |
| ২০০৪-০৫ | ৩৭০৭০৭.০ | ৩৮৫৭৫.৪৬ | ৩১৩২৫.৪৬ | ২৯৯০৪.৪৬ | ১০.৪১% | ৮.৪৫ | ৮.০৭ | ৮.৪৫ |
| ২০০৫-০৬ | ৪১৫৭২৮.০ | ৪৪১৩১.৪৩ | ৩৫৫২৮.৪৩ | ৩৪০০২.৪৩ | ১০.৬২% | ৮.৫৫ | ৮.১৮ | ৮.৫৫ |
| ২০০৬-০৭ | ৪৬৭৪৯৭.৩ | ৪৯৩৮৩.২২ | ৩৯০৭৪.৩২ | ৩৭২১৯.৩২ | ১০.৫৬% | ৮.৩৬ | ৭.৯৬ | ৮.৩৬ |
| ২০০৭-০৮ | ৫৪৫৮২০.০ | ৫৪৫০০.০০ | ৪৮০১০.০০ | ৪৭২৮৯.১৭ | ৯.৯৮ | ৮.৮০ | ৮.৬৬ | ৮.৮০ |
| ২০০৮-০৯ | ৬১৪৮০০.০ | ৬৪৫৬৭.০০ | ৫২৮৬৮.০০ | ৫০২১৫.০০ | ১০.৫০ | ৮.৬০ | ৮.১৭ | ৮.৬০ |
| ২০০৯-১০ | ৬৯২৩৮০.০ | ৭৯৪৮৪.০০ | ৬৩৯৫৬.০০ | ৬২০৪৫.৭০ | ১১.৪৮ | ৮.৯৬ | ৮.৯৬ | ৯.২৪ |

## পরিশিষ্ট ২: এনবিআরের বিভিন্ন বর্তমান এবং প্রস্তাবিত পদসমূহ

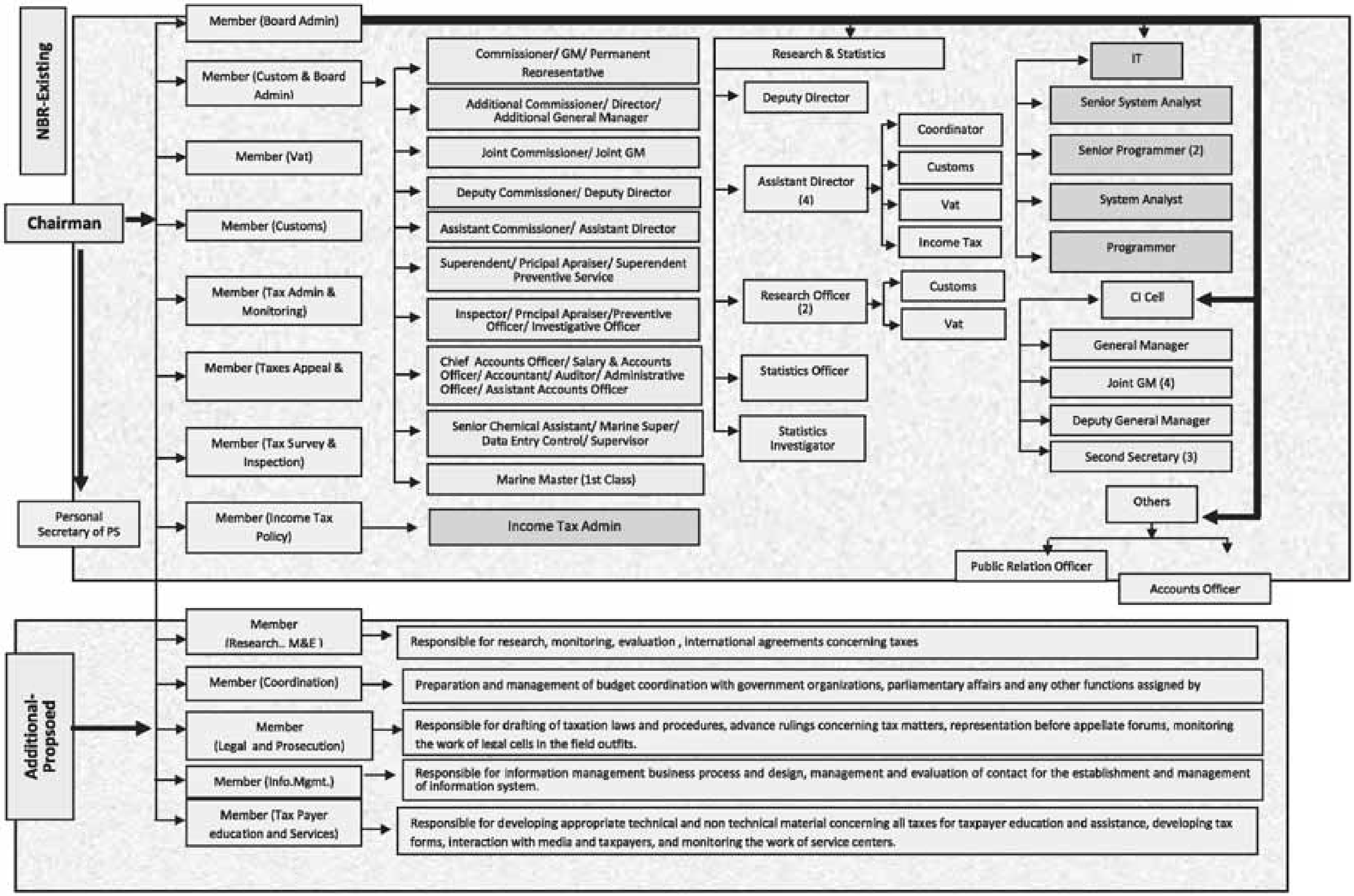

## পরিশিষ্ট ৩: আয়কর আইনের পরিবর্তনের প্রস্তাব

- Sec. 9. To abolish or revising this Sec. so that tax officers can't interpret wrongly
- Sec. 19.: The NBR should see the decisions of the above authorities on Sec. 19 and instruct the Officers not to misinterpret Sec. 19 and its sub-sections, again and again
- Sec. 48. This Section should be revised to ensure the deduction/refund be adjusted with final assessed taxes should be enjoyed by the taxpayer whose income is below the taxable limit and who has no Income Tax file
- Sec. 57. Presses on Tax-Payers to fulfill this illegal behavior should be stopped and Tax-Payers be saved from harassment's.
- Sec. 62. To monitor the malpractices made by taxmen and exemplary punishment
- Sec. 72-c. The NBR should see that the assessees must get 10% interest for such delayed payment.
- Sec. 82 BB. Before the last filing date of such Returns as per Sec.75, the NBR should issue Circular vividly describing the detailed process of Audit to be followed by taxmen, so that the Assessees could decide well ahead whether they will go for USA system u/s. 82 BB or prefer for normal assessment u/s.83(2)
- Sec. 93. So it is ripe time for NBR to stop free use and misuse of this vital section.
- Sec. 84. The concerned DCT should be constructed for misconduct, as per amendment of F.A. 2002, but that has not been done yet.
- Sec. 79. So the tendency of avoiding law and such illegalities should be checked by the NBR
- Sec. 82-c. DCTs should be refrained from pocking nose in 82-c cases.; Under this section a DCT has been given wide discretion in the matter of assessment, which needs restrain from NBR.
- Sec. 134. There are Tribunal decisions where it has been said that 10% is required for this tax purpose. Interest and penalty will not be included 10% calculation.
- Sec. 137. This Section should be deleted, since there lies provisions for 10% Penal interest for delayed payment of Tax
- Sec. 146. a) In Order to stop this Refund Business the NBR can issue clear Order on the DCT's to pay all the undisputed Refund with due interest @ 71/2% within one months time; b) Interest rate should be 10% for both Govt. and asseessee, as was before. To save the assessees from paying 60% as Bribe, Sec. 146, 135 (IA) and 135 (IC) should be strictly followed and the internal Order of involvement of IACT, CT and NBR by creating for different ceilings, should be withdrawn
- Sec. 149. Such illegalities continue unabated
- Sec. 153. Instead of honoring those decisions valid Appeal cases are rejected on the plea of Sec.153 and as such NBR should direct the Appellate Authorities to honor the decisions of Hon'ble High Courts and Ld. Tribunals
- Sec. 168. The NBR should restrain itself and also to alert its subordinate Officers about these offences and relevant punishment of upto 6 months imprisonment or with fires
- Sec. 173. In the name of correction of errors, these illegalities should be stopped by NBR
- Sec. 178. Notices should be sent by Registered Post to check the forgery of dispatch date. These forgeries have been detected by the Appellate authorities and Tribunal Benches and those were duly mentioned in their Judgments

## পরিশিষ্ট ৪: প্রচলিত শুল্ক আইন বোধগম্য কিনা

| শুল্ক আইন সম্পর্কে উত্তর | সংখ্যা | উত্তরের শতকরা হার | উত্তর (শতকরা হার) |
|---|---|---|---|
| বোধগম্য | ১ | ০.৭ | ০.৭ |
| মোটামোটি সহজ | ৭৮ | ৫৭.৮ | ৫৭.৮ |
| সহজ নয় | ৪৬ | ৩৪.১ | ৩৪.১ |
| নিরুত্তর | ১০ | ৭.৪ | ৭.৪ |
| মোট | ১৩৫ | ১০০ | ১০০ |

**পরিশিষ্ট ৫: চট্টগ্রাম শুল্ক হাউজে অটোমেশনের প্রভাব (২৮)**

| পদক্ষেপসমূহ | প্রকৃতি/ধরন | অটোমেশনের পূর্বে | অটোমেশনের পরে | ফলাফল/ঝুঁকিসমূহ |
|---|---|---|---|---|
| কারিগরি প্রযুক্তির উৎস, অর্থায়ন এবং সফটওয়ার পরিচালনা | সফটওয়ার তৈরি, বিশেষজ্ঞের ধরন | বিদেশি কোম্পানির নিকট বিদেশি অনুদান এবং ঋণের বিনিময়ে কেনা হতো | ⇨ পুরোপুরি দেশিয় বিজ্ঞানীদের তৈরি সফটওয়ার<br>⇨ প্রাথমিক ফান্ড চট্টগ্রাম চেম্বার করেছিল; ডাটাসফট এটা BOOT পদ্ধতিতে পরিচালনা করে আসছিল | ⇨ বিদেশি ঋণ সাশ্রয়<br>⇨ দেশিয় প্রযুক্তির প্রসার<br>⇨ চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি |
| শুল্কায়নের স্তরসমূহ | পদ্ধতি | ম্যানুয়াল পদ্ধতি (টেবিল হতে টেবিল) | অ্যাসেসমান্ট মডিউল হতে স্বয়ংক্রিয় অটোমেশন | ⇨ করদাতার সাথে সাক্ষাৎকারের সময় কমেছে। |
| | পণ্য আমদানি | ৪২টি ধাপ/টেবিল | ৫টি ধাপ | ⇨ এজেন্ট/রপ্তানিকারক/ইপিজেডের ব্যবহারকরীদের অনেক সময় কম লাগছে;<br>⇨ ঘুষ গ্রহণের সুযোগ হ্রাস পেয়েছে<br>⇨ নিজের অফিস হতে বিল অব এন্ট্রি জমা দানের সুযোগ |
| | পণ্য রপ্তানি | ১১৬টি ধাপ/টেবিল | ৬টি ধাপ | |
| শুল্কায়নে সময় | বিল পরিশোধের পর | জমা দানের ৩ দিনের মধ্যে মাত্র ৪২ শতাংশ পণ্য ছাড় করাতে পারতো | একদিনের ভেতর ৭০ শতাংশ এবং ৩ দিনের মধ্যে ৭০ শতাংশ সমাপ্ত হওয়া | ⇨ দ্রুত সরকারি রাজস্ব সংগহ;<br>⇨ ব্যাংক হতে অটোমেটেড বিল সংগ্রহ করা হয় |
| পরিচালনা ব্যয় | বৈধ সিএন্ডএফ এজেন্ট, রপ্তানিকারক/ আমদানিকারক | প্রতি বিল অব এন্ট্রি বাবদ ৭০ টাকা এবং ঘুষ | প্রতি বিল অব এন্ট্রি বাবদ ৫০ টাকা | ⇨ শুধুমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত কারিগরি স্টাফ কোড পরিবর্তন করতে পারে<br>⇨ ঘুষের বিনিময়ে কর আত্মসাৎকারীর সফটওয়ারের ভেতর পরিবর্তন হতে পারে |
| ইনডেমনিটি বন্ডসমূহ | অনিস্পত্তিকৃত রিট পিটিশন | ফাইল এবং দলিলাদি সংরক্ষণে অব্যবস্থাপনা | ⇨ ১২,৬৭৭ টি ইনডেমনিটি ফাইলের ডাটাবেজ তৈরি<br>⇨ ১০,০৩৩টি রিট পিটিশন ফাইলের অটোমেশন | ⇨ এনবিআর প্রায় ১২ বিলিয়ন টাকা বকেয় রাজস্ব পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়<br>⇨ গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস |
| অনলাইন হিসাব ব্যবস্থাপনা | হিসাব হালনাগাদ রাখা | রিভলভিং হিসাবের ব্যালেন্স জানতে ৪-৫ ঘন্টা লাগতো | ⇨ যে কোন সময় যে কোনো জায়গা হতে কয়েক মিনিটের মধ্যে ব্যালেন্স দেখা সম্ভব | ⇨ শত শত লেজার বই বা হিসাবের খাতা সংরক্ষণের ঝামেলা নেই |
| বন্দর হতে পণ্য ছাড় | দলিলাদি জমা দান | ৪০ ধরনের দলিল জমা দিতে হতো | মাত্র ১৪ ধরনের দলিল জমা দিতে হয় | বন্দর হতে পণ্য ছাড়ে জটিলতা কমে সময় কম লাগে |
| আমদানি/রপ্তানি আদেশ ইস্যু | বেপজার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হতো | আমদানি/রপ্তানি আদেশ ম্যানুয়েলি ইস্যু করা হতো | অনলাইনে দাখিল করা হয় | সময় এবং খরচ বেঁচে গেছে |

সূত্র: মুখ্য তথ্যদাতা, পর্যবেক্ষণ

পরিশিষ্ট ৬: উৎস করের তালিকা

| No. | Heads | Section/Rule | Rate | Challan in the name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salaries | Section 50 | deduction at average rate | Respective Zone |
| 2 | Discount on the real value of Bangladesh Bank Bills | Section 50A | Deduction at normal rate or maximum rate whichever is greater | LTU |
| 3 | Interest on securities | Section 51 | 10on interest or discount | LTU |
| 4 | Supply of goods and execution of contracts and sub-contracts | Section 52(Rule 16) | nil up to 1 lac, 1-5 lacs (1), 5-15 lacs (2.5), 15-25 lacs 3.5 and 25 lacs and above (4) | Zone-2 (Partly) & LTU |
| 5 | Indenting commission / Shipping agency commission | Section 52 (Rule 17) | 3.5 of the total receipt of indenting commission & 5 of total Shipping agency commission receipt | Zone-2 |
| 6 | Royalty, Fees for professional/technical services | Section 52 A | 10 of the fees | Zone-8 |
| 7 | Stevedoring agency & Security service | Section 52 AA | 7.5 of the fees | Ctg. Zone-2 |
| 8 | C & F agency commission | Section 52 AAA | 7.5 of the fees | Zone-2 |
| 9 | Sale of bandrolls (for biri) | Section 52B | 6 of the value of bandrolls. | Respective Zone |
| 10 | Compensation for acquisition of property | Section 52C | 6 of the compensation money | Zone-2 |
| 11 | Interest on saving instruments | Section 52D | 10 of the amount of interest (Current rate) | Zone-2 |
| 12 | Collection of tax from brick manufacturers/each brick field) | Section 52F | 1 Sec. = Tk.10,000; 1.5 Sec. = Tk.12,000 2 Sec. = Tk.18,000 | Respective Zone |
| 13 | Commission on Letter of Credits | Section 52I | 5 of the amount of commission. | LTU |
| 14 | Issuing & Renewal of trade license | Section 52K | Tk 500/- For renewal of each License | Zone-3 |
| 15 | Trustee fees | Section 52L | 10 | |
| 16 | Freight Forward agency | Section 52M | 7.5 | |
| 17 | Rental power | Section 52N | 4 | |
| 18 | Import of goods | Section 53 (Rule17A) | 3 of the value of imports. | Zone-2 |
| 19 | Income from house property (house rent) | Section 53A (Rule17B) | No deduction if monthly rent is below 20,000/- ; 3 (if monthly rent is 20,000-40,000 Tk.) and 5 (if monthly rent is above 40,000 Tk.) | Zone-2 Dha & Other outside Zone |
| 20 | Shipping business of resident | Section 53AA | 5 of freight | Zone-2,ctg |

| No. | Heads | Section /Rule | Rate | Challan in the name |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Export of manpower | Section 53B (Rule 17C) | 10 of the service charges. | Zone-2, dhk & ctg |
| 22 | Export of Knitwear | Section 53BB | 0.25 | Zone-5 |
| 23 | Member of Stock Exchange | Section 53BBB | 0.015 | Zone-7 |
| 24 | Export of goods except Knitwear & Woven garments | Section 53BBBB | 0.25 | Zone-5 |
| 25 | Sale of goods by public auction | Section 53C (Rule 17D) | 5 of the sale price | Zone-2 |
| 26 | Courier Service (Non-resident) | Section 53CC | 7.5 | Zone-6 |
| 27 | Payment to film actors and actresses | Section 53D (Rule 17E) | 5 of the amount paid exceeding Tk. 36000/- | Zone-2 |
| 28 | Cash subsidy | Section 53DD | 5 | Zone-5 |
| 29 | Commission Fees or discount paid to distributors | Section 53E (Rule 17G) | 7.5 Of the amount of commission. | Zone-2 & LTU |
| 30 | Commission or charges paid to the agents of foreign buyers | Section 53EE | 4 on the amount of commission or charges | Dhk.Zone-6, Ctg.Zone-3 and Zone of Respective Division |
| 31 | Interest on bank deposits | Section 53F (Rule 17H) | 10 of the amount of interest. | Zone-1 |
| 32 | Real Estate & Developers | Section 53FF | In case of Bldg. 250 per sq. meter In case of land 5 of deed value | Zone-5 |
| 33 | Insurance commission | Section 53G | 3 on the amount of commission | LTU |
| 34 | Commission paid to the Surveyors of General Insurances | Section 53GG | 7.5 on the amount of commission. | Dhk.Zone-2, Ctg.Zone-3 and Zone of Respective Division |
| 35 | Transfer of property | Section 53H (Rule 17I) | 5 of the value of the property. | Survey Zone |
| | Interest on Post Office Savings Bank Account | Section 53I | No deduction if the amount of interest does not exceeds Tk.1, 50,000 and if exceeds then 10 on the amount of interest. | Zone-2 |
| 36 | Rent of vacant land, plant and machinery | Section 53J (Rule 17BB) | No deduction if monthly rent is below 15,000/-; 3 (if monthly rent is 15,000 -30,000 Tk.) and 5 (if monthly rent is above 30,000 Tk.) | Zone-2 |
| 37 | Advertising bill of news paper, magazine, private TV channel | Section 53K | 3 of the value of the property. | Zone-5 |
| 38 | Dividend | Section 54 | (1) Resident individual 10, non-resident individual 25 (2) Company 15 | LTU (only LTU's files) all others Zone-2 |
| 39 | Income from lottery | Section 55 | 20 of the amount won. | Zone-2 |
| 40 | Income of non-resident Other than non-resident Bangladeshi} | Section 56 | Company - rate applicable to the com. Other than company - maximum rate. | Zone-6 |

## পরিশিষ্ট ৭: কর অবকাশ প্রাপ্ত পণ্যসমূহ

**Fiscal incentives:**

Following fiscal incentives are available for the assesses

a) Tax holiday till 30th June 2008 in fulfillment of certain conditions for newly established industrial undertaking, tourist industry, and physical infrastructure facility such as-

**Industrial Undertaking:**

production of textile, textile machinery, high value garments, pharmaceuticals, melamine, plastic products, ceramics, sanitary ware, steel from iron ore, fertilizer, insecticide & pesticide, computer hardware, Petrochemicals, basic raw materials of drugs, chemicals, pharmaceuticals, agricultural machine, ship building, boilers, compressors;

**Physical Infrastructure:**

sea or river port, container terminals, internal container depot, container freight station, LNG terminal and transmission line, CNG terminal and transmission line, gas pipe line, flyover, large water treatment plant & supply through pipe line, waste treatment plant, export processing zone.

**Tourist Industries:**

a) Residential hotel having facility of three stars or more.

b) Accelerated depreciation on cost of machinery is admissible for new industrial undertaking in the first year of commercial production.

c) Initial depreciation allowance for first year on machinery @25 of cost and in respect of factory building @ 10 of cost if the said factory or machinery is constructed or installed in Bangladesh after 30th June, 2002.

d) Industry set up in EPZ is exempt from tax for a period of 10 years from the date of commencement of commercial production.

Income from fishery, poultry, cattle breeding, dairy farming, horticulture, floriculture, mushroom cultivation and sericulture are exempt from tax up to 30th June, 2008, subject to investing at least 10 of the exempt income that exceed one lakh Taka.

e) Income derived from export of handicrafts.

f) An amount equal to 50 of the income derived from export business is exempt from tax.

g) Listed companies are entitled to 10 tax rebate if they declare dividend of 20 or more.

h) Income from computer software business up to 30th June, 2008 .

## পরিশিষ্ট ৮: ঘুষ লেনদেনের পরিমাণ এবং হার

| কর প্রদানকারীর ধরন | ঘুষের ঘটনা | গড় ঘুষের পরিমাণ | | ২০০৫-০৬ অর্থবছরের কর রিটার্নের সংখ্যা | ঘুষের সার্বিক লেনদেন (কোটি টাকায়) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | প্রচুরক | গড় | | প্রচুরক | গড় |
| ব্যক্তিগত | ২৩.৮ | ১০০০.০ | ১০৩৫.৭ | | - | - |
| কোম্পানী | ৩৫.১ | ৪০০০০.০ | ৩৫৮৩৩.৩ | | - | - |
| সার্বিক | ২৮.১ | ২০০০.০ | ১১৩৬৯.৬ | ৫২৫,৯৯৪ | ২৯.৬ | ১৬৮.০ |

## পরিশিষ্ট ৯: আইনজীবি নিয়োগ (শতকরা হার)

| করদাতাদের ধরন | আইনজীবি নিয়োগ | আইনজীবি নিয়োগ ছাড়া |
|---|---|---|
| ব্যক্তিগত | ৬৭.৪ | ৩২.৬ |
| কোম্পানী | ৯২.২ | ৭.৮ |
| **সার্বিক** | ৭৭.৮ | ২২.২ |

*পরিশিষ্ট ১০: আপিল চুড়া ন্ত হওয়ার মাস*

| কর দাতার ধরন | মাসিক গড় | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | N |
|---|---|---|---|---|
| ব্যক্তিগত | ১৬.৫ | ১২ | ২১ | ২ |
| কোম্পানী | ৮.৮ | ১ | ৩০ | ১৭ |
| *সার্বিক (N=২৩)* | *৯.০* | *১* | *৩০* | *২৩* |

*পরিশিষ্ট ১১: ২০০৫-০৬ এর বিচারিক অবস্থা*

| *ট্রায়াল প্রক্রিয়ার রিপোর্টিং* | *উত্তর (শতকরা হার)* |
|---|---|
| বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন | ৬৮.৮ |
| বিচার প্রক্রিয়া চুড়ান্ত নয় | ২০.৮ |
| আপীল/ কেস চলছে | ১০.৪ |

*পরিশিষ্ট ১২: করমুক্ত সীমা এবং কর হার*

| **Taxable Income/Companies** | **Amount/Tax Rate** | |
|---|---|---|
| **Individual Taxpayer** | | |
| Taxable Income range (In Tk.) | Individuals other than Female and Senior taxpayers of age 70 years and above and retarded taxpayers | Female and Senior taxpayers of age 70 years and above and retarded taxpayers |
| First 1,65,000 | Nil | - |
| First 1,80,000 | - | Nil |
| Next 2,75,000 | 10 | 10 |
| Next 3,25,000 | 15 | 15 |
| Next 3,75,000 | 20 | 20 |
| Rest Amount | 25 | 25 |
| Minimum Tax for any Individual Assesses | Tk. 2000 | |
| Non-Resident Individual (Other than NRB) | 25 | |
| **Companies** | | |
| Public Traded Company | 27.5; but If any publicly traded company declares more than 20 dividend, 10 rebate on total tax | |
| Non-Publicly Traded Company | 37.5 | |
| Bank, Insurance and Financial Company | 45 | |
| Mobile Phone Operator Company | 45 | |

Source: http://www.nbr bd.org/incometax.html

**পরিশিষ্ট ১৩: কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সের জন্য ঘুষ**

| | কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সের জন্য সরকারি ফি ( N = ৫৬৭) | যদি হ্যাঁ হয়, ঘুষের পরিমাণ বা পুরস্কার (N = ৩৩১) | অন্যান্য ঘুষ (N=১৭) |
|---|---|---|---|
| সার্বিক | ৩১৫,৪০৭.৬৬ | ২,৩৪৫.৪১ | ২,০৭৬.৪৭ |
| জিয়া এয়ারপোর্ট | ১৬৭,৮৩৯.০৭ | ২,৬১১.৮০ | ২,৩০০.০০ |
| চট্টগ্রাম | ২০০,৫১১.৮৭ | ২,৯৯৭.৬৫ | ২,০৪৬.৬৭ |
| বেনাপোল পোর্ট | ৬৪৬,৬০৩.৯৪ | ১,৩৯৭.৯২ | |
| আইসিডি | ১,২৬৯,০০০.০০ | ৫,২০০.০০ | |

**পরিশিষ্ট ১৪: কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সের জন্য ঘুষ আ অবৈধ অর্থ (শতকরা হার)**

| কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সের জন্য ঘুষ আ অবৈধ অর্থ | ঢাকা কাস্টমস হাউজ | চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজ | অন্যান্য | গার্বিক |
|---|---|---|---|---|
| নটিং সেকশনে কম্পিউটার ওপারেটর | | ১০০ | ৯.১ | ৯৪.৬ |
| অডিটবিহীন ফাইল ছাড়া | | ৮৯.৭ | ১০০ | ৮৭.৫ |
| Get back to group after completion of bill of entry | ৫০ | ৮৮.৯ | ১০০ | ৮৭.৮ |
| প্রিন্সিপাল এপ্রাইজাল | ১০০ | ৯৪.৭ | ১০০ | ৯৫.৩ |
| উর্ধ্বতন শুল্ক কর্মকর্তার স্বাক্ষর | ১০০ | ৪৭.২ | ১০০ | ৫৩.৭ |
| Putting seal in the group after completion of customization | ৫০ | ১০০ | ১০০ | ৯৭.৪ |
| At Out pass | ১০০ | ১০০ | | ১০০ |
| ব্যাংকে কর প্রদান | ১০০ | ৮৬.২ | ১০০ | ৮৭.৯ |
| করারোপের পর রিলিজ ওর্ডার নেয়ার সময় | ১০০ | ৮৮.২ | ৫.৯ | ১০০ |
| ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার | ১০০ | ১০০ | | ১০০ |
| রিপিটার | | ১০০ | | ১০০ |
| আইন প্রয়োগকারী সংস্থা | ১০০ | ৮১.৮ | | ৮৪.৬ |
| ডসর পুটার | | ৭২ | ১০০ | ৬৯ |
| এপ্রাইজার | ১০০ | ১০০ | | ১০০ |
| এপ্রাইজিং ক্লার্ক | ১০০ | ১০০ | | ১০০ |
| Return file again in the customs | ১০০ | ১০০ | | ১০০ |
| অন্যান্য | ১০০ | | | ১০০ |

**পরিশিষ্ট ১৫: হয়রানির ধরন**

| হয়রানীর ধরন | উত্তর (শতকরা হার) |
|---|---|
| Obstructed to file delivery | ৭.৪ |
| ঘুষ দাবী | ৭৯.৮ |
| দুব্যবহার | ০.৪ |
| বিভিন্ন কাগজপত্র প্রদনের জন্য চাপ | ৫.৬ |
| অন্যান্য | ৬.৯ |
| মোট (N=৮৪৩) | ১০০.০ |

**পরিশিষ্ট ১৬: শুল্কায়ন প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত দিন**

| শুল্কায়নের বিভিন্ন সেবা | N | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | গড় |
|---|---|---|---|---|
| আইজিএম ক্লার্ক | ১৫ | ১ | ৩ | ১ |
| বিল অব এন্ট্রি | ১১ | ১ | ২ | ১ |
| নটিং সেকশনে কম্পিউটার ওপারেটর | ২ | ১ | ৪ | ৩ |
| অডিটবিহীন ফাইল ছাড়া | ২ | ০.৫৮ | ২ | ১ |
| To go to group after Bill of Entry | ৬ | ০.৪২ | ৫ | ৩ |
| প্রিন্সিপাল এপ্রাইজাল ও প্রাইজাল অফিসার | ৭ | ০.১৭ | ৩ | ২ |
| উর্ধ্বতন শুল্ক কর্মকর্তার স্বাক্ষর | ৫ | ০.২১ | ৫ | ২ |
| Taking seal after back to group completing taxation | ১ | ৩ | ৩ | ৩ |
| ব্যাংকে কর প্রদান | ২ | ১ | ১ | ১ |
| করারোপের পর রিলিজ ওর্ডার নেয়ার সময় | ৩ | ১ | ১ | ১ |
| Straddle Carrier Operator | ১৫ | ০.০১ | ১২ | ২ |
| পুলিশ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা | ১ | ২ | ২ | ২ |
| এপ্রাইজার | ৩ | ২ | ২ | ২ |
| এপ্রাইজিং ক্লার্ক | ১ | ০.১৭ | ০.১৭ | ০ |
| অন্যান্য | ১ | ২ | ২ | ২ |

**পরিশিষ্ট ১৭: জরিপে অংশগ্রহণকারীর হার**

| ব্যবসা/সেবার ধরন | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| শিল্প কারখানা | ৭ | ২.২ |
| চিত্রশিল্পী | ৫ | ১.৬ |
| ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ক্লিনিক, হসপিটাল | ১২ | ৩.৮ |
| ব্যাংক ইন্সুরেন্স, অডিট ফার্ম | ৫ | ১.৬ |
| দোকান and Stores | ১২৪ | ৩৯.০ |
| কন্সট্রাকশান ফার্ম এবং ঠিকাদার | ১৫ | ৪.৭ |
| অন্যান্য | ২৯ | ৯.১ |
| এসএমই | ১০ | ৩.১ |
| ডাক্তার | ১৮ | ৫.৭ |
| রেস্টুরেন্ট, চাইনিজ, বেকারি, ফাস্ট ফুড | ২১ | ৬.৬ |
| ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল | ৪ | ১.৩ |
| কেবল ওপারেটর, সিনেমা হল, কমিউনিটি সেন্টার | ৯ | ২.৮ |
| কনসাল্টটেন্সি, প্রেস, কুরিয়ার, ডেকোরেটর, ট্রাভেল, মানবসম্পদ | ৬ | ১.৯ |
| অন্যান্য | ৫৩ | ১৬.৭ |
| **সার্বিক** | **৩১৮** | **১০০** |

**পরিশিষ্ট ১৮: ভ্যাট প্রশাসনে সমস্যা**

| ভ্যাট প্রশাসনে প্রধান সমস্যা | উত্তরের ভিত্তিতে | ঘটনার ভিত্তিতে |
|---|---|---|
| অফিসারদের অসততা | ৩৫.৪ | ৭৮.৬ |
| পদ্ধতিগত জটিলতা | ৩২.৩ | ৭১.৮ |
| ফাইল ও কাগজপত্র সংরক্ষণে সমস্যা | ২১.০ | ৪৬.৬ |
| অন্যান্য | ১১.৪ | ২৫.২ |
| সার্বিক (N=২২৯) | ১০০ | ২২২.৩ |

**পরিশিষ্ট ১৯: ভ্যাট নির্ধারণের বিভিন্ন ভিত্তি**

| বিভিন্ন ভিত্তি | শতকরা হার |
|---|---|
| বিক্রয় হিসাব | ২৩.৫ |
| সেবার জন্য পেমেন্ট | ১৮.৫ |
| ফিক্সড অর্থ | ৫৪.৬ |
| অন্যান্য | ২.৬ |
| জানিনা/ নিরুত্তর | ০.৭ |
| সার্বিক (N= ৩০২) | ১০০ |

**পরিশিষ্ট ২০: মুসক প্রদানকারীদের নির্ধারণের পদ্ধতি**

| মুসকের অর্থ নির্ধারণের ভিত্তি | সংখ্যা | উত্তরের ভিত্তিতে |
|---|---|---|
| বিক্রয়ের পরিমাণ | ৭৩ | ২৯.২ |
| বিক্রয় পরিমানের খসড়া হিসাব | ৮ | ৩.২ |
| নেগোসিয়েশন অথবা বার্গেইনিং | ৪২ | ১৬.৮ |
| ইন্সপেক্সনের মাধ্যমে | ১৩ | ৫.২ |
| অন্যান্য অথবা lump -sum | ১১৪ | ৪৫.৬ |
| **সার্বিক** | **২৫০** | **১০০** |

**পরিশিষ্ট ২১: ঘুষ প্রদান না করার জন্য হয়রানির প্রকৃতি**

| হয়রানির প্রকৃতি | উত্তরের ভিত্তিতে | হয়রানরি ধরন (ঘটনার ভিত্তিতে) |
|---|---|---|
| ফাইল ছাড়করণ থামিয়ে দেয়া | ১২.২ | ২৮.০ |
| মূসকযোগ্য আয়ের অতিরিক্ত অ্যাসেসমেন্ট | ৩.৫ | ৮.০ |
| মুসক অফিসারদের দুব্যবহার | ২২.৭ | ৫২.০ |
| অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেয়ারা জন্য চাপ | ২৫ | ৫৭.৩ |
| মুসক প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করার হুমকী | ২৮.৫ | ৬৫.৩ |
| অডিট আপত্তি নিস্পত্তির জন্য অনির্দিষ্ট সময় | ৩.৫ | ৮.০ |
| অন্যান্য | ৪.৭ | ১০.৭ |
| **সার্বিক (N=১৭২)** | **১০০** | **২২৯.৩** |

## পরিশিষ্ট ২২: হয়রানির ধরন

| হয়রানির প্রকৃতি | উত্তরের ভিত্তিতে | হয়রানরি ধরন (ঘটনার ভিত্তিতে) |
|---|---|---|
| বিভিন্ন সার্কেলে ঘুরতে বলা | ১.৪ | ২.৬ |
| মুসক অফিসারদের বেশি দিন সময় নেয়া | ২৯.১ | ৫৫.২ |
| মুসক সংগ্রাহকদের ঘুষ দাবী | ১০.০ | ১৯.০ |
| বিভিন্ন টেবিলে ঘোরা | ১৭.৭ | ৩৩.৬ |
| বিভিন্ন ধরণের কাগজপত্র জমা দেয়া | ২৮.৬ | ৫৪.৩ |
| অন্যান্য | ১৩.২ | ২৫.০ |
| **সার্বিক (N=২২০)** | **১০০** | **১৮৯.৭** |

## পরিশিষ্ট ২৩: মুসক রিফান্ড পাওয়ার জন্য হয়রানির প্রকৃতি

| হয়রানির প্রকৃতি | (শতকরা হার) % |
|---|---|
| কাগজপত্র পুনরায় দেয়া | ৫৫.৪ |
| কাগজপত্র পুনরায় না দেয়া | ৪২.৬ |
| নিরুত্তর | ২ |

## পরিশিষ্ট ২৪: মুসক প্রদানকারীর ঘুষ প্রদানের মাত্রা

| মুসক প্রদানকারী | ঘুষ দাতাদের সংখ্যা | ঘুষের পরিমাণ (টাকা) | |
|---|---|---|---|
| | | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ |
| ডিসে'০৭ (n=২৮৭) | ১২ | ৫০ | ১,০০০ |
| জানু'০৮ (n =২৮৪) | ১৩ | ৫০ | ২,০০০ |
| ফেব্রু'০৮ (n =২৮৬) | ১৩ | ৫০ | ১,০০০ |
| মার্চ'০৮ (N =৩০১) | ১৪ | ৫০ | ৪,০০০ |

## পরিশিষ্ট ২৫: আপিল এবং মামলায় হয়রানির ধরন

| হয়রানির প্রকৃতি | উত্তর (%) | ঘটনা (%) |
|---|---|---|
| মামলাসমূহ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা | ৩৫.৩ | ৮৫.৭ |
| অতিরিক্ত খরচ | ২৩.৫ | ৫৭.১ |
| বিচারকার্যে বিচার না পাওয়া | ১৭.৬ | ৪২.৯ |
| স্টাফদের ঝামেলা | ১১.৮ | ২৮.৬ |
| অন্যান্য | ১১.৮ | ২৮.৬ |
| **সার্বিক (মোট=১৭)** | **১০০** | **২৪২.৯** |

ISBN : 978-984-33-3669-9

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৮৮২৬০৩৬, ৯৮৮৭৪৯০, ৮৮৫৪৪৫৬
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

9789843336699